Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া ইসলাম

রোলঃ ২১৫০০৬৭১

৩০ নভেম্বর,২০২৩ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া ইসলাম

রোলঃ ২১৫০০৬৭১

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া ইসলাম, আইডিঃ ২১৫০০৬৭১ বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, "রোজার গুরুত্ব ও ফজিলত" শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুহাম্মদ জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

Sumaiya Islam

(স্বাক্ষর)

সুমাইয়া ইসলাম

আইডিঃ ২১৫০০৬৭১

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৩ ইং

সূচিপত্র

১. প্রারম্ভিকা --৫

২. রমজানের তাৎপর্য --৮

৩. রমজান মাসের ফজিলত --১২

৪. ইতিহাসে রমজানের গুরুত্ব ---১৭

৫. রোজার পরিচয় --১৯

৬. সিয়ামের ফজিলত --২১

৭. সিয়ামের আদব সমূহ --২৭

৮. সিয়ামের হিকমত, লক্ষ্য এবং উপকারিতা ---------------------------------৩৫

৯. লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য -------------------------------------৫১

১০. রোজা সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত --------------------------৫৩

১১. রোগ প্রতিরোধে রোজার ভূমিকা ---৫৫

১২. রোজার কতিপয় মাসাইল ---৫৭

১৩. নফল রোজার গুরুত্ব ---৬৮

১৪. শেষ কথা ---৭৯

প্রারম্ভিকা

মানবজাতির কল্যাণের জন্য মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রদত্ত বিধানের নাম ইসলাম। যুগে যুগে আল্লাহ তার মনোনীত মহামানবদের মাধ্যমে মানুষের জন্য পাঠিয়েছেন হিদায়াত এই ধারাবাহিকতায় সর্বশেষ হেদায়েতের মহাগ্রন্থটির নাম আল-কুরআন। সূরা আল বাকারার শুরুতেই এর পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ج هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ - اَلَّذِيْنَ
يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُوْنَ - وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ
قَبْلِكَ وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ - اُوْلٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ
وَاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ -

"এটি আল্লাহ তাআলার কিতাব, এতে কোন প্রকার সন্দেহ নেই। এটি জীবন যাপনের ব্যবস্থা সেই মুত্তাকীদের জন্য, যারা অদৃশ্যকে বিশ্বাস করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিজিক দিয়েছি তা হতে ব্যয় করে। যে কিতাব তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যেসব গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবকেই বিশ্বাস করে এবং পরকালের প্রতি যাদের দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে। বস্তুত: এই ধরনের লোকেরাই তাদের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ জীবন ব্যবস্থার অনুসারী এবং তারাই কল্যাণ পাবার অধিকারী।" (সূরা বাকারা : ২-৫)

কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব ও যাকাত- এই পাঁচটি স্তরের উপর ইসলাম দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত। রোজা হচ্ছে ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ। আমরা কুরআন ও হাদিসের আলোকে তুলে ধরার চেষ্টা করব রমজানের গুরুত্ব, আমাদের কাঙ্ক্ষিত অর্জন এবং প্রয়োজনীয় মাসআলা।

রমজান শব্দটি   থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ পুড়িয়ে ফেলা, জালিয়ে দেয়া। গুনাহকে পুড়িয়ে শেষ করে দেয় বলে এর নাম রমজান। রমজানের রোজাকে ফরজ করে মহান আল্লাহ এরশাদ করেন:

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى
الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ –

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের মত তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হয়েছে। সম্ভবত এভাবে তোমরা তাকওয়ার অধিকারী হবে।" (সূরা বাকারা: ১৮৩)

এই আয়াত থেকে জানা গেল, রোজার মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া। তাকওয়ার আভিধানিক অর্থ হলো ভয় করা। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন, তাকওয়া অর্থ হচ্ছে আল্লাহর আদেশ আনুগত্য করা, তার নাফরমানি না করা, আল্লাহকে স্মরণ করা, তাকে ভুলে না যাওয়া এবং আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা ও তার কুফরি না করা।

প্রখ্যাত তাবেই তালাক ইবনে হাবিব (রহ.) বলেছেন: আল্লাহর প্রতি তাকওয়ার অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর আলোর রোশনিতে তার হুকুমের আনুগত্য করা ও সওয়াবের আশা করা এবং আল্লাহর শক্তিকে ভয় করে তার নাফরমানি ত্যাগ করা।

ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) উবাই ইবনে কা'ব (রা.)-কে তাকওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। উবাই (রা.) বলেন, উপায় আপনি কি কাটাযুক্ত পথে চলেছেন? ওমর (রা.) বলেন, হা। উবাই (রা.) বলেন কিভাবে চলেছেন? ওমর (রা.) বলেন, গায়ে যেন কাটানো লাগে সেজন্য চেষ্টা করেছি ও সতর্কভাবে চলেছি। উবাই (রা.) বলেন, এটাই হচ্ছে তাকওয়ার উদাহরণ।

অর্থাৎ সমাজে ছড়িয়ে থাকা অন্যায়, অসত্য, হারাম ও নিষিদ্ধ কাজ পরিহার করে সাবধানতার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার নামই হচ্ছে তাকওয়া। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী মহাগ্রন্থ আল-কুরআন নাযিল হয়েছে পবিত্র রমজান মাসে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ
مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ط
وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ط يُرِيْدُ
اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ.

"রমজান এমন একটি মাস যে মাসিক কুরআন নাযিল করা হয়েছে, যা স্পষ্ট হিদায়াত ও শিক্ষার পরিপূর্ণ। যা হেদায়েতের পথ-প্রদর্শক এবং হক ও বাতিলের মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য সূচনাকারী। সুতরাং এখন থেকে যে ব্যক্তিই এ মাসে জীবিত থাকবে, সে-ই পূর্ণ মাসের রোজা রাখবে। আর কেউ যদি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে কিংবা সফরে থাকে, তবে সে অন্য সময় রোজাগুলো পূর্ণ করবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য সহজ করে দিতে চান কঠিন করতে চান না। এ ব্যবস্থা তোমাদেরকে এজন্য বলা হচ্ছে যেন তোমরা রোজার সংখ্যা পূর্ণ করতে পারো আর যে হিদায়াত আল্লাহ তোমাদেরকে দিয়েছেন সেজন্য তার মহত্ব প্রকাশ করতে, স্বীকৃতি দিতে ও শোকরগোযার হতে পারো।" (সূরা বাকারা : ১৮৫)

আমরা জানি, জ্ঞানের দ্বিতীয় প্রধান উৎস হচ্ছে হাদিস। তাই রোজার গুরুত্ব, মর্যাদা, প্রাপ্তি সহ খুঁটিনাটি বিভিন্ন দিক পরিষ্কার করার জন্য আল-কুরআনুল কারীম ও সহীহ বুখারীর কিতাবুস সাওম ও অন্যান্য কিতাব থেকে আলোচনা তুলে ধরছি।

রমজানের তাৎপর্য

১. রমজান রহমতের মাস

রমজান মাস রহমতের মাস হাদিস শরীফে এসেছে:

هُوَ شَهْرٌ اَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَاَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَاٰخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ -

এটি এমন একটি (রমজান) মাস, যার প্রথম দশক 'রহমতের', দ্বিতীয় দশক 'মাগফিরাতের' ও তৃতীয় দশক 'জাহান্নাম থেকে মুক্তি' লাভের জন্য নির্দিষ্ট।

"রমজানের প্রতিটি দিবা-নিশিতে অসংখ্য জাহান্নামবাসীকে মুক্তি দেয়া হয়। আর প্রতিটি মুসলমানের একটি করে দুয়া কবুল করা হয়।"

রমজান মাস আল্লাহর রহমত ও বরকতের মাস। এই মাসে আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের দরজা খুলে দেওয়া হয়। এই রহমতের ফলে মুমিন বান্দাদের অন্তরে ঈমানের আলো প্রজ্বলিত হয় এবং প্রত্যেক ব্যক্তি বরকত লাভ করে। রমজানের রোজায় পানাহার ও কামাচার থেকে বিরত থাকার কষ্ট মুসলমানদেরকে গরিব-দুঃখীদের দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করতে শেখায়। ধনীরা গরিবদের বন্ধু হয় এবং তাদের দুঃখ-কষ্ট বুঝতে পারে। তারা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় এবং দুঃখ-কষ্ট লাঘবে একসাথে কাজ করে। এতে সমাজের মানুষের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি হয়। এ সব কিছুই আল্লাহর রহমতের কারণে হয়। তাই বলা হয় যে, রমজান মাস রহমতের মাস। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর বান্দাদের প্রতি যেমন বেশি রহমত করেন, তেমনি রমজানের রোজাদার ব্যক্তিও আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি বেশি সহানুভূতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি নিতে হবে।

اِرْحَمُوْا مَنْ فِى الاَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِى السَّمَاءِ -

"যারা পৃথিবীতে আছে তাদের প্রতি দয়া করো, তাহলে আসমানে যিনি আছেন তিনিও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।" (আবু দাউদ, তিরমিযী)

"রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, রমযানের শেষ দশকের রাতে জিবরাঈল (আ.) অন্যান্য ফেরেশতাদের সাথে পৃথিবীতে অবতরণ করেন এবং ঐ বান্দার জন্য রহমত ও ক্ষমা প্রার্থনা করেন, যে দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে আল্লাহর যিকর ও ইবাদতে মশগুল থাকে।" (বায়হাকী)

২. রমজান আত্মসংগ্রামের মাস

রমযান মাস আত্মশুদ্ধির মাস। রোযা রাখার মাধ্যমে আত্মসংযম, আত্মনিয়ন্ত্রণ, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির মহান সুযোগ পাওয়া যায়, যা অন্য কোন ইবাদতে পাওয়া সম্ভব নয়। আত্মসংযম সাধনে রোযা হচ্ছে প্রশিক্ষণ স্বরূপ। আত্মসংযম ও সবরের মাধ্যমেই রোযার ফায়দা লাভ করা যায়। রোযা মানুষের নৈতিক চরিত্র এমন এক পর্যায়ে উন্নত করে, যাতে করে রোযাদার ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা, নফসের কামনা-বাসনার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে। রোযা মানুষের দেহ-মনের সমস্ত শক্তিকে এমনভাবেই বশে রাখতে সক্ষম করে তোলে যে, সকল ধরনের লোভ-লালসা এবং নিজের নফসের অশুভ শক্তির মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়। সাধারণত মানুষের পাশবিক কামনা-বাসনার উৎস হচ্ছে তিনটি জিনিস। যথা:

· খাদ্য

· যৌন চাহিদা

· বিশ্রামের চাহিদা

এ তিনটি জিনিসের জন্যই মানুষ দুনিয়াতে অন্যায়-অবিচার, যুলুম-নির্যাতন, ঝগড়া-বিবাদ ও সন্ত্রাসের মত জঘন্য কাজ করে থাকে। রোযা এ তিনটিকেই নিয়ন্ত্রণ ও করায়ত্ত করে ব্যক্তিকে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট সমর্পণ করিয়ে দেয়। তখন যদি কোন সন্ত্রাসী কোন রোযাদার ব্যক্তিকে ফেতনায় জড়াতে চায়, এমনকি হত্যা করতে চায়, তখনই সে একথা বলে দেয়, أَنَا صَائِم "আমি রোযাদার" । সংযম শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রোযা ছাড়া অন্য কোন ইবাদতে নেই।

৩. রমজান ইখলাসের মাস

ইখলাস হচ্ছে নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের মুক্তির উদ্দেশ্যে জীবনের সকল কাজ করা। নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, জিহাদ, পরোপকার, ইকামতে দ্বীনের কাজ করা, শিক্ষা দান করা, শিক্ষা গ্রহণ করা, মানুষকে খাওয়ানো, দান করা ইত্যাদি সকল নেক কাজ একমাত্র খালিসভাবে আল্লাহ উদ্দেশ্যে করতে হবে। নিয়ত খালিস না হলে ইবাদত শির্কযুক্ত হতে পারে। আর শির্কযুক্ত ইবাদত আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই আল্লাহ তাআলা রমযানের এক মাস রোযা ফরয করে লোক-দেখানো মনোবৃত্তি দূর করার প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। রোযা এমন এক ইবাদত রোযাদার ব্যতীত আর কেউই বলতে পারবে না প্রকৃতপক্ষে সে রোযা রেখেছে কিনা? মানুষ দেখবে না গভীর অন্ধকারে সে একাধিক রোযা ভঙ্গের কোন কাজ করলো কিনা অথবা গভীর পানিতে ডুব দিয়ে সে পানি পান করলো কিনা। রোযাদার কেবলমাত্র এক আল্লাহর ভয়েই সেখানে এমন কোন কাজ করে না যাতে করে রোযা নষ্ট হয়ে যায়। এটাই হলো ইখলাস। জীবনের সকল ক্ষেত্রে, সকল কাজে ও সকল ইবাদতে বান্দা যাতে নিষ্ঠাবান হয় রমযান সে শিক্ষাই দেয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

وَمَا أُمِرُوْا اِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ـ

"আর তাদেরকে এটা ব্যতীত অন্য কোন হুকুমই দেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহর ইবাদত একনিষ্ঠভাবে তাঁরই জন্য করুক।" (বাইয়্যিনাহ: আয়াত ৫)

৪. রমজান তওবা কবুলের মাস

তাওবা শব্দের অর্থ ফিরে আসা। গুনাহগার বান্দা স্বীয় গুনাহের কারণে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে তাওবার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং ভবিষ্যতে এ রকম গুনাহ যাতে পুনরায় সংঘটিত না হয় সে জন্য আল্লাহর দিকে ফিরে আসে। বান্দা যত বড় গুনাহই করুক না কেন, সে যদি খাঁটি মনে তাওবা করে এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য চায়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তার তওবা কবুল করেন এবং তাকে হকের পথে থাকার তাওফীক দেন।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন: "তিনি সেই সত্তা যিনি বান্দাদের তাওবা কবুল করেন, তাদের গুনাহ মাফ করেন এবং তোমরা যা কিছু করো তা তিনি জানেন। (সূরা শুরা: আয়াত ২৫)

ক্ষমা ও মাগফিরাতের বিরাট সুযোগ রয়েছে এ রমযান মাসে। এ মাসে দিবা-নিশিতে হরহামেশা আল্লাহ তাআলা দু'আ কবুল করেন এবং যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তার তাওবা কবুল করেন। কাজেই আমাদের উচিত রমযান মাসে সগীরা কবীরা সকল গুনাহ মাফের জন্য আল্লাহর নিকট অত্যন্ত বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করা।

এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَاِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ -

অর্থ: যে ব্যক্তি রমযান মাসে রোযা রাখবে ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় তার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ মাফ হয়ে যাবে।" (বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)

৫. রমজান পরিশ্রম ও প্রশিক্ষণের মাস

"পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি"। শ্রম-সাধনা ছাড়া কোন কিছুই লাভ করা যায় না। রমযান হচ্ছে কঠোর পরিশ্রমের ও শ্রম-সাধনার মাস। পরবর্তী একাদশ মাসে আল্লাহর ইবাদত, হালাল রিযক অনুসন্ধান এবং দাওয়াতে হকের কাজসহ জীবনের যাবতীয় কাজের জন্য বান্দাকে কতটুকু পরিশ্রমী হতে হবে তারই প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। রমযান মাসে ত্রিশ দিন ব্যাপী দীর্ঘ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হয়। অতঃপর অবসাদগ্রস্ত শরীরে মাগরিবের নামায পড়তে হয়। একটু পরেই ইশা ও তারাবীহ নামাযের আহবান। তারাবীহ নামায শেষে একাটানা ফজর পর্যন্ত না ঘুমিয়ে সেহরীর জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে সজাগ হতে হয়, তাহাজ্জুদের নামায পড়তে হয়, কুরআন তিলাওয়াত ও অধ্যয়নের পরপরই ফজরের নামায। এর চেয়ে পরিশ্রমের উত্তম কর্মসূচী আর কি হতে পারে? মহাজ্ঞানী আল্লাহ তাআলা মুসলিম মিল্লাতের অলসতা ও শ্রমবিমুখতাকে দূর করার জন্যই এ সুন্দর ব্যবস্থা করেছেন। সারা বিশ্বের কোটি কোটি

মানুষ একই সাথে রমযানের সিয়াম সাধনায় মশগুল থাকে। কিভাবে রমযান শেষ হয়ে যায় রোযাদাররা তা টেরও পায় না।

রমজান মাসের ফজিলত

রমজান মাসের আগমনে মুসলিমগণ আনন্দ প্রকাশ করে থাকেন। আনন্দ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:-

﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِۦ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۟ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ۝٥٨ ﴾ يونس: ٥٨

বল, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায়। সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা সঞ্চয় করে এটা তার চেয়ে উত্তম।

পার্থিব কোন সম্পদের সাথে আল্লাহর এ অনুগ্রহের তুলনা চলে না, তা হবে এক ধরনের অবাস্তব কল্পনা। যখন রমজানের আগমন হত তখন রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অতিশয় আনন্দিত হতেন, তার সাহাবাদের বলতেন:-

أتاكم رمضان شهر مبارك. سنن النسائي : ٢١٠٥

তোমাদের দ্বারে বরকতময় রমজান মাস এসেছে এরপর তিনি এ মাসের কিছু ফজিলত বর্ণনা করে বলতেন:-

فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه النسائي: ٢١١٨

আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য সিয়াম পালন ফরজ করেছেন। এ মাসে আকাশের দ্বারসমূহ খুলে দেওয়া হয়। বন্ধ করে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজাগুলো। অভিশপ্ত শয়তানকে বন্দী করা হয়। এ মাসে রয়েছে একটি রাত যা হাজার রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তি এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো সে মূলত সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হলো।

আমাদের কর্তব্য: আল্লাহর এই অনুগ্রহের মূল্যায়ন করতে চেষ্টা করা, এ মাসের ফজিলত ও তাৎপর্য অনুধাবনে সচেষ্ট হওয়া ও ইবাদত বন্দেগি সহ সকল কল্যাণকর কাছে নিয়ে যেতে থাকা। এ মাসের ফজিলত রয়েছে তা হলো:-

১. একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কে রয়েছে আর তা হলো সিয়াম পালন:

হজ যেমন জিলহজ মাসের সাথে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে সে মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে এমন সিয়াম রমজান মাসে হওয়ার কারণে এ মাসের মর্যাদা বেড়ে গেছে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:-

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٨٣ ﴾
البقرة: ١٨٣

'হে মুমিনগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে, যেমনি ফরজ করা হয়েছে তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর-যাতে তোমরা মুত্তাকি হতে পার।' (সূরা বাকারা : ১৮৩)

রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ইসলাম যে পাঁচটি ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত তার একটি হল সিয়াম পালন। এ সিয়াম জান্নাত লাভের একটি মাধ্যম; যেমন হাদীসে এসেছে:-

من آمن بالله ورسولـه، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، كان حقاً على الله أن يدخله الجنة ... رواه البخاري: ٧٤٢٣

যে আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনল, সালাত কায়েম করল, যাকাত আদায় করল, সিয়াম পালন করল রমজান মাসে, আল্লাহ তাআলার কর্তব্য হয়ে যায় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো। (বুখারী ৭৪২৩)

২. রমজান হল কুরআন নাজিলের মাস:

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:-

﴿ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ ١٨٥ ﴾
البقرة: ١٨٥

রমজান মাস এতে নাযিল করা হয়েছে কুরআন যা মানুষের দিশারী এবং স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারী (সূরা বাকারা: ১৮৫)

রমজান মাসে সপ্তম আকাশের লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার আকাশের বায়তুল ইজ্জতে পবিত্র আল-কুরআন একবারে নাযিল হয়েছে। সেখান থেকে আবার রমজান মাসে অল্প অল্প করে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর প্রতি নাযিল হতে শুরু করে। কুরআন নাযিলের দুটি পর্বই রমজান মাসকে ধন্য করেছে। শুধু আল-কুরআনই নয় বরং ইবরাহীম (আ.)-এর সহীফা, তাওরাত, যবুর, ইঞ্জীল সহ সকল ঐশী গ্রন্থ এ মাসে অবতীর্ণ হয়েছে বলে তাবরানী বর্ণিত একটি সহীহ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে।

রমজান মাস, যে মাসে নাজিল করা হয়েছে আল–কোরআন, মানুষের জন্য হিদায়াত রূপে এবং পথনির্দেশনার প্রমাণ ও সত্য-মিথ্যা পার্থক্য নির্ণয়কারী হিসেবে। এ মাসে মানুষের হিদায়াত ও আলোকবর্তিকা যেমন নাযিল হয়েছে তেমনি আল্লাহর রহমত হিসেবে এসেছে সিয়াম। তাই এ দুই নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করতে বেশি বেশি করে কুরআন তিলাওয়াত করা উচিত। প্রতি বছর রমজান মাসে জিবরীল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে পূর্ণ কুরআন শোনাতেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাকে পূর্ণ কুরআন শোনাতেন। আর জীবনের শেষ রমজানে আল্লাহর রাসূল দু বার পূর্ণ কুরআন তিলাওয়াত করেছেন। সহীহ মুসলিমের হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত।

৩. রমজান মাসে রয়েছে লাইলাতুল কদর:

আল্লাহ তায়ালা বলেন লাইলাতুল কদর সহস্র মাস অপেক্ষা উত্তম সে রাতে ফেরেস্তা ও রুহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে শান্তি শান্তি ঊষার আবির্ভাব পর্যন্ত (সূরা কদর ৩- ৫)

৪. রমজান মাস দুয়া কবুলের মাস :

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন রমজান মাসে প্রত্যেক মুসলিমের দোয়া কবুল করা হয় অন্য হাদিসে এসেছে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন রমজানের প্রতি রাতে ও দিনে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন এবং প্রতি রাত ও দিবসে মুসলিমের দোয়া প্রার্থনা কবুল করা হয় তাই প্রত্যেক মুসলমানকে এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নিজের কল্যাণের জন্য যেমন দোয়া প্রার্থনা করবে তেমনি সকল মুসলিমের কল্যাণ শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জ্ঞাপন করবে।

৫. রমজান মাস পাপ থেকে ক্ষমা লাভের মাস:

যে ব্যক্তি রমজান মাস পেয়েও তার পাপসমূহ ক্ষমা করানো থেকে বঞ্চিত হলো আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ধিক্কার দিয়েছেন তিনি বলেছেন ওই ব্যক্তির নাক ধুলায় ধূসরিত হোক যার কাছে রমজান মাস এসে চলে গেল অথচ তার পাপগুলো ক্ষমা করা হয়নি সত্যিই সে প্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত যে এ মাসেও আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত রয়ে গেল।

৬. রমজান জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের মাস :

রাসূলুল্লাহ সাঃ বলেছেন 'রমজান মাসের পর প্রথম রজনীর যখন আগমন ঘটে তখন খারাপ ও অসৎ জিনগুলোকে বন্দি করা হয়। জাহান্নামের দরজাগুলো বন্ধ করে দেয়া হয়। জান্নাতের দরজাগুলো খুলে দেয়া হয়। প্রত্যেক রাতে একজন ঘোষণাকারী এ বলে ঘোষণা দিতে থাকে যে, হে সৎকর্মের অনুসন্ধানকারী তুমি অগ্রসর হও! হে অসৎ কাজের অনুসন্ধানকারী তুমি থেমে যাও! এ মাসের প্রতিরাতে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নাম থেকে বহু মানুষকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

৭. রমজান মাসে সৎকর্মের প্রতিদান বহুগুনে বৃদ্ধি করে দেয়া হয় :

হাদিসে এসেছে যে, রমজান মাসে ওমরাহ করলে একটি হজ্জের সোয়াব পাওয়া যায়। সুধু তাই নয় ,বরং রমজান মাসে ওমরাহ করা আল্লাহর রাসূলের সাথে হজ আদায়ের

মর্যাদা রাখে। এমনিভাবে সকল ইবাদাত-বন্দেগীসহ সকল সৎকাজের প্রতিদান কয়েকগুন বৃদ্ধি করে দেয়া হয়।

৮. রমজান ধৈর্য ও সবরের মাস :

এ মাসে ঈমানদার ব্যক্তিগন খাওয়া- দাওয়া,বিবাহ-শাদি ও অন্যানো সকল আচার - আচরণে ধৈর্য ও সবরের এত অধিক অনুশীলন করেন তা অন্য কোন মাসে বা অন্য কোন সময় করেন না. এমনিভাবে সিয়াম পালন করে যে ধৈর্যের প্রমান দেয়া হয় তা অন্য কোন ইবাদতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন

''ধৈয্যশীলদের তো বিনা হিসাবে পুরস্কার দেয়া হবে''

৯. রোযাদারগণ জান্নাতে প্রবেশ করবে 'রাইয়ান' নামক বিশেষ দরজা দিয়ে :

হযরত সাহল ইবনে সা'দ রা. হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنّ فِي الجَنّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرّيّانُ، يَدْخُلُ مِنْهُ الصّائِمُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، يُقَالُ : أَيْنَ الصّائِمُونَ؟ فَيَقُومُونَ، لاَ يَدْخُلُ مِنْهُ أَحَدٌ غَيْرُهُمْ، فَإِذَا دَخَلُوا أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ أَحَدٌ.

জান্নাতে একটি দরজা আছে, যার নাম রাইয়ান। কিয়ামতের দিন এ দরজা দিয়ে কেবল রোযাদার ব্যক্তিরাই প্রবেশ করবে। অন্য কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। ঘোষণা করা হবে- কোথায় সেই সৌভাগ্যবান রোযাদারগণ? তখন তারা উঠে দাড়াবে। তারা ব্যতীত কেউ এ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। অতঃপর রোযাদারগণ যখন প্রবেশ করবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে। ফলে কেউ ঐ দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে পারবে না। সহীহ বুখারী, হাদীস ১৮৯৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫২; মুসনাদে আহমদ, হাদীস ২২৮১৮

ইতিহাসে রমজানের গুরুত্ব

রোজা হলো নিয়তের সঙ্গে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকা। যুগে যুগে বিভিন্ন নবি-রাসূলদের জামানায় এ রোজা ফরজ ছিল।

উম্মতে মুহাম্মাদির ওপর এরই ধারাবাহিকতায় রোজা ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'হে ইমানদারগণ, তোমাদের ওপর রোজা ফরজ করা হয়েছে, যেমন রোজা ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত : ১৮৩)।

প্রত্যেক নবি-রাসূলের ওপর রোজা ফরজ থাকলেও এর সময়সীমা, মাস ও সংখ্যা নিয়ে কিছুটা তারতম্য ছিল। প্রতি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোজা ফরজ ছিল হজরত আদম (আ.)-এর ওপর। এ তিন দিনের রোজাকে বলা হয় আইয়্যামে বিজের রোজা। এর পেছনের কারণ সম্পর্কে হজরত আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ বর্ণনা করেন, 'আল্লাহতায়ালা হজরত আদম (আ.)-কে জান্নাতে এক ধরনে ফল খেতে বারণ করেছিলেন।

কিন্তু তিনি আল্লাহর সে আদেশ অমান্য করে ওই ফলটি খেয়ে ফেলেন। যার কারণে হজরত আদম (আ.) জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়ে পৃথিবীতে আসতে বাধ্য হন। সে সময় তার দেহের রং কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। ফেরেশতারা হজরত আদম (আ.)-এর এ দুর্দশা দেখে কেঁদে ফেলেন। এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করেন-হে আল্লাহ, আদম তোমার শ্রেষ্ঠ মাখলুক, তুমি তাকে জান্নাতে স্থান দিয়ে আমাদের দিয়ে সিজদাও করিয়েছিলে।

মাত্র একটি ভুলের কারণে তার শরীরের রং কালো করে দিলে। তখন আল্লাহতায়ালা তাদের প্রার্থনার জবাবে হজরত আদম (আ.)-এর কাছে ওহি পাঠালেন, 'তুমি চন্দ্র মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখের রোজা পালন কর।' স্বয়ং নবিজি সফরে থাকা অবস্থায়ও বাড়িতে বসে এ আইয়্যামে বিজের রোজা রাখতেন।

হজরত নুহ (আ.)-এর সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। তিনি ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিন ছাড়া সারা বছর রোজা রাখতেন। হজরত নুহ (আ.)-এর যুগ থেকে শেষ

নবি হজরত মুহাম্মাদ (সা.) পর্যন্ত; প্রতি মাসে তিনটি রোজার প্রচলন ছিল। অবশেষে আল্লাহতায়ালা রমজান মাসের রোজা দিয়ে এ রোজাকে রহিত করে দিলেন। হজরত নুহ (আ.)-এর পরের সময় নবি ছিলেন হজরত ইবরাহিম (আ.)। তার সময়ও এ একই রোজার বিধান চালু ছিল।

আশুরার দিন আল্লাহতায়ালা বনি ইসরাইলকে দুশমন থেকে রক্ষা করলেন। তাই হজরত মুসা (আ.) এ দিনে রোজা রেখেছেন। মহানবি (সা.) নিজেও এ দিনে রোজা রাখতেন এবং তার উম্মতদের এ দিনে রোজা রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। তাই ৯ ও ১০ মহররম বা ১০ ও ১১ মহররম এ দুই দিন রোজা রাখতে হবে। তবে মহররমের ৯ ও ১০ তারিখ রোজা রাখাই উত্তম।

হজরত দাউদ (আ.) ছিলেন আল্লাহর নবি ও রাসূল। তার সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। এ সময়কার রোজাই ছিল শ্রেষ্ঠ রোজা। হজরত রাসূল (সা.) হজরত আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.)-কে উদ্দেশ করে বলেন, 'তুমি শ্রেষ্ঠ রোজা রাখবে। আর তা হলো দাউদ (আ.)-এর রোজা। একদিন রোজা রাখবে। আর একদিন রোজা রাখবে না।' (মিশকাত)

হজরত ঈসা (আ.)-এর সময়ও রোজার প্রচলন ছিল। যার প্রমাণ করছে পবিত্র আল-কুরআন, 'তুমি খাও ও পান করো এবং চোখ জুড়াও; যখন তুমি মানুষদের কাওকে দেখতে পাবে তখন বলবে, আমি রহমান আল্লাহর নামে রোজার মানত করেছি। আমি আজ কোনো মানুষের সঙ্গে কথা বলব না।' (সূরা মারইয়াম, আয়াত : ২৬)।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর রোজা ফরজ হয় দ্বিতীয় হিজরির শাবান মাসে। যা ছিল মহানবি (সা.)-এর কিবলা পরিবর্তনের সময় ও হিজরতের অষ্টাদশ মাস। মহানবি (সা.)-এর ওপর রোজা ফরজ হওয়ার পর, পরে নবি ও রাসূলদের জামানার রোজার যে বিধান ছিল তার ফরজিয়াত রহিত হয়েছে। তবে আগে এ রোজাগুলো সুন্নতি আমল হিসাবে এখনো কার্যকর রয়েছে।

রোজার পরিচয়

সাওমের আভিধানিক অর্থ :

সাওম (الصَّوْمُ) শব্দটি আরবী, একবচন, এর বহুবচন হলো (الصِّيَام) সাওম। সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয়। ফার্সিতে বলা হয় রোযা এবং রোযা পালনকারীকে বলা হয় রোযাদার। এর শাব্দিক অর্থ হলো, পানাহার ও নির্জনবাস থেকে বিরত থাকা। অভিধানে শব্দটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে,

الصَّوْمُ فِي اللُّغَة: الإمساكُ عَن الشيءِ والتَّرْكُ لَهُ. وَقيل للصائمِ صَائِم: لإمساكه عَن الْمطعم وَالْمشْرَب والمنكح.

“কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা, সাওম পালনকারীকে ‘সায়েম’ বলা হয় এজন্য যে, সে খাদ্য, পানীয় ও জৈবিক চাহিদা থেকে বিরত থেকেছে।”

وَقيل للصامت: صَائِم، لإمساكه عَن الْكَلَام. وَقيل للفرسِ: صَائِم، لإمساكه عَن العَلَف مَعَ قِيَامه.

“চুপ থাকা ব্যক্তিকে ‘সায়েম’ বলা হয়, কেননা সে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। এমনিভাবে যে ঘোড়া খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত রয়েছে তাকেও ‘সায়েম’ বলা হয়।”

ইবন ‘আরাবী রহ. বলেছেন,

وصامَ الرجلُ: إِذا تَظَلَّلَ بالصَّوْم، وَهُوَ شجر؛ قالهُ ابْن الْأَعرَابِي.

“কোনো ব্যক্তি যখন গাছের নিচে ছায়া নিচ্ছে তাকে বলা হয় ‘সমার রজুল।” (লোকটি ছায়ায় থেকে চলাফেরা থেকে বিরত থেকেছে)।

লাইস রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ: تَرْكُ الْأكل وترْكُ الْكَلَام.

“সাওম হলো খাদ্য ও কথা বলা থেকে বিরত থাকা।” যেমন কুরআনে এসেছে,

﴿فَكُلِي وَٱشۡرَبِي وَقَرِّي عَيۡنٗاۖ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ ٱلۡبَشَرِ أَحَدٗا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرۡتُ لِلرَّحۡمَٰنِ صَوۡمٗا فَلَنۡ أُكَلِّمَ ٱلۡيَوۡمَ إِنسِيّٗا ٢٦﴾ [مريم: ٢٦]

“অতঃপর তুমি খাও, পান করো এবং চোখ জুড়াও। আর যদি তুমি কোনো লোককে দেখতে পাও তাহলে বলে দিও, ‘আমি পরম করুণাময়ের জন্য চুপ থাকার মানত করেছি। অতএব, আজ আমি কোনো মানুষের সাথে কিছুতেই কথা বলব না।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ২৬]

وَصَامَ الفَرَس على آرِيِّه: إذا لم يَعْتَلِف. والصومُ: قِيَامٌ بِلَا عَمل. وصامَتِ الرِّيحُ: إذا رَكَدَتْ.

“ঘোড়া যখন খাদ্য খাওয়া থেকে বিরত থাকে তাকে বলা হয় ‘সমাল ফারাস’, আবার সাওম অর্থ কোনো কাজ না করা। বলা হয়, ‘সমাতির রিহ’ বাতাস যখন থেমে থাকে।”

সুফিয়ান ইবন ‘উয়াইনাহ রহ. বলেছেন,

الصَّوْمُ هُو الصَّبْرُ، يَصْبِرُ الإنسانُ عَلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ وَالنِّكَاحِ، ثُمَّ قَرَأَ: إِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ.

“সাওম অর্থ ধৈর্য। কেননা মানুষ খাদ্য, পানীয় ও স্ত্রী সহবাস থেকে ধৈর্য ধারণ করে। অতঃপর তিনি এ আয়াতটি পড়েন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰبِرُونَ أَجۡرَهُم بِغَيۡرِ حِسَابٖ ١٠﴾ [الزمر: ١٠]

“কেবল ধৈর্যশীলদেরকেই তাদের প্রতিদান পূর্ণরূপে দেওয়া হবে কোনো হিসাব ছাড়াই”। [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ১০] [১]

সাওমের পারিভাষিক সংজ্ঞা :

আল-কামুসুল ফিকহি গ্রন্থে বলা হয়েছে,

الصوم هو إمساك عن المفطرات، حقيقة، أو حكما، في وقت مخصوص، من شخص مخصوص، مع النية .وقيل: الصوم هو إمساك المكلف بالنية من الليل من تناول المطع

“সাওম হলো, নির্দিষ্ট সময় সুনির্দিষ্ট কার্যাবলী থেকে নিয়তসহ সাওম ভঙ্গকারী হাকীকী ও হুকমী (খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ) বিষয় থেকে বিরত থাকা।”[২]

কারও কারও মতে, ‘সাওম হচ্ছে মুকাল্লাফ তথা শরী’আতের নির্দেশনা প্রযোজ্য এমন লোকের পক্ষ থেকে নিয়তসহ রাত থেকে খাবার-পানীয় থেকে বিরত থাকা।

যুরযানী রহ. বলনে,

عبارة عن إمساك مخصوص وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع من الصبح إلى المغرب مع النية.

"সুবহে সাদিক থেকে মাগরিব পর্যন্ত খাদ্য গ্রহণ এবং যৌনাচার থেকে নিয়তের সাথে বিরত থাকার নাম হলো সাওম।"[৩]

বদরুদ্দীন 'আইনী রহ. বলেন,

الصوم هو الإمساك عن المفطرات الثلاثة نهاراً مع النية.

"খাওয়া, পান করা এবং যৌনসম্ভোগ -এ তিনটি কাজ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকার নাম হলো সাওম।"[৪] শরী'আতের দৃষ্টিতে সুবহে সাদিক থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার, যৌন সম্ভোগ ও শরী'আত নির্ধারিত বিধি-নিষেধ থেকে নিয়তসহ বিরত থাকাকে সাওম বলে। শরী'আতে ঈমান, সালাত ও যাকাতের পরেই সাওমের স্থান। যা ইসলামের চতুর্থ রুকন।

মহান আল্লাহ আমাদেকে তার নির্দেশিত রাসুল (সা.) প্রদর্শিত পদ্ধতিতে সিয়াম পালন করার তাওফিক দান করুন। আমিন।

সিয়ামের ফজিলত

সিয়াম হলো ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের তৃতীয়। রমজান মাসের রোজা রাখা মুসলমানদের জন্য ফরজ। সিয়ামের অনেক ফজিলত ও গুরুত্ব রয়েছে। নিচে এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

ক. সিয়াম শুধু আল্লাহর জন্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের সাথে সিয়ামের সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। এমনিভাবে তিনি সকল ইবাদত বন্দেগী থেকে সিয়ামকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছেন।

যেমন তিনি এক হাদীসে কুৎসিত বলেছেন:

"মানুষের প্রতি কাজ তার নিজের জন্য কিন্তু সিয়াম তার ব্যতিক্রম তা শুধু আমার জন্য আমি তার প্রতিদান দেব।"(মুসলিম)

এই হাদিস দ্বারা আমরা অনুধাবন করতে পারেন নেক আমলের মাঝে সিয়াম পালনের গুরুত্ব আল্লাহর কাছে কত বেশি।

তাই সাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) যখন বলেছিলেন:

"হে রাসূলুল্লাহ! আমাকে অতি প্রেমের নির্দেশ দিন। তুমি সিয়াম পালন করো কারণ সমূহ মর্যাদার আর কোন আমল নেই।"

সিয়ামের এত মর্যাদার কারণ কি তা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ভালো জানেন। তবে আমরা যা দেখি তা হলো সিয়াম এমন একটা লোক দেখানো ভাব থাকে না। বান্দা ও আল্লাহ তায়ালার মধ্যকার একটি অতি গোপনীয় বিষয়। সালাত, হজ্জ, যাকাত সহ অন্যান্য ইবাদত বন্দেগি কে করলো তা দেখা যায়। পরিত্যাগ করলে বুঝা যায়। কিন্তু সিয়াম পালনে লোক দেখানো বা শোনানোর ভাবনা থাকে না। ফলে সিয়ামের মাঝে এ ক্লাস আন্তরিকতা বা আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠতার নির্ভেজাল ও বেশি থাকে।

খ. সিয়াম ঢাল ও কু -প্রবৃত্তি থেকে সুরক্ষা দেয়

সিয়াম পালনের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ সাঃ ও প্রবৃত্তি থেকে বাঁচার দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন:

"হে যুবকেরা! তোমাদের মাঝে যে সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা বিবাহ দৃষ্টিকে অবনত করেও লজ্জাস্থানকে সুরক্ষা দেয়। আর যে বিবাহের সামর্থ্য রাখেনা সে যেন সিয়াম পালন করার, কারণ এরা তার রক্ষাকবচ। (মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোজা রাখতে নিজেকে ঢাল করতে বলে এবং অন্য লোকেও তাদের প্রবৃত্তি বজায় রেখে দেয়, তার সকল পূর্ব গুনাহ মাফ হয়ে যায়।" (সহীহ বুখারি)

সিয়াম পালনকারী যেমনি নিজের অন্তরকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তেমনি সকল অশ্লীল আচরণ, ঝগড়া-বিবাদ অনর্থক কথা ও কাছ থেকে নিজের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে হেফাজত করে।

গ. সিয়াম জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল

হাদিসে এসেছে:

সিয়াম হল ঢাল ও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার মজবুত দুর্গ।(আহমদ)

বুখারী ও মুসলিম হাদিসে এসেছে-

"যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একদিন সিয়াম পালন করবে আল্লাহ তার থেকে জাহান্নামকে ৭০ বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেবেন।"

উলামায়ে কেরাম বলেছেন, 'আল্লাহর পথে সিয়াম পালনের অর্থ হলো শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সিয়াম পালন করা।' এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বহুবার সিয়াম পালনকারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন।

যেমন হাদিসে এসেছে: 'ইফতারের সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে থাকেন। আর এটা রমজানের প্রতি রাতে।' (বায়হাকী)

ঘ. সিয়াম হল জান্নাত লাভের পথ

ইসলামে, সিয়াম একটি বিশেষ ইবাদত, যা মুসলিমদের জীবনে মহত্ত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং এটি জান্নাতে প্রবেশ করতে একটি পথ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। সিয়মের মাধ্যমে মুসলিমদের আত্মনির্ভরশীলতা, তাকওয়া, এবং নেতৃত্বের গুণাবল উন্নত করা হয় এবং এটি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশের দিকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য একটি অভূতপূর্ব পথ হিসেবে অনুমোদন দেয়।

কুরআনে:

হাদিসে:

রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "যে ব্যক্তি রোজা রাখে, তার অসংখ্য গুনাহ মাফ হয়ে যায় এবং তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা উখান করা হয়।" (সহীহ বুখারি)

আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“জান্নাতের আটটি দরজা আছে। এর মধ্যে একটি দরজার নাম হলো ‘রাইয়ান’। রমজান মাসে রোজা পালনকারীরা এই দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।” (বুখারি)

আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জন ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভের জন্য সিয়ামের সাথে কোন আমলে তুলনা হয় না। সিয়াম পালনকারীদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ আরেকটি দৃষ্টান্ত হলো তিনি জান্নাতে একটি দরজা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যে দরজা দিয়ে সিয়াম পালনকারী ছাড়া অন্যকেউ প্রবেশ করবে না।

ঙ. সিয়াম ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের মাধ্যম

সিয়াম ইহকাল ও পরকালের সাফল্যের মাধ্যম। এটি মানুষের ইহকালীন জীবনে সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু লাভের কারণ হয়। পরকালে এটি মানুষের জান্নাত লাভের কারণ হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“রোজাদারের জন্য দুটি আনন্দ রয়েছে। একটি আনন্দ হলো ইফতারের সময়। আরেকটি আনন্দ হলো কিয়ামতের দিন, যখন তার রবের সামনে তার রোজার সাওয়াব পেশ করা হবে।” (মুসলিম)

আরেকটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"তিনটি কারণে সকল মুসলিমের জন্য সিয়াম অত্যন্ত ভালো: সিয়াম জন্নাতের দরজাগুলি খোলে দেয়, মাসবর্ধন হওয়ার সময়ে তার পাপ মাফ হয় এবং তার প্রতি দিন দুই বার দুআ করা হয়।" (সহীহ বুখারি)

চ. সিয়াম কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে

সিয়াম কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য সুপারিশ করবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“রোজা তোমাদের জন্য কিয়ামতের দিন সুপারিশ করবে। সে বলবে, হে রব, আমি তাকে দিনের বেলা খাওয়া থেকে এবং রাতের বেলা পান করা থেকে বিরত রেখেছি। তাই তুমি তাকে তোমার ছায়াতলে স্থান দাও।” (তিরমিযি)

আরেকটি হাদিসে এসেছে:

আব্দুল্লাহ বিন আমোর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: সিয়াম ও কুরআন কিয়ামতের দিন মানুষের জন্য এভাবে সুপারিশ করবে যে, সিয়াম বলবে হে প্রতিপালক! আমি দিনের বেলা তাকে পানাহার ও যৌনতা থেকে বিরত রেখেছি তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। কুরআন বলবে প্রতিপালক আমি তাকে রাতে নিদ্রা থেকে বিরত রেখেছি, তাই তার ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ কবুল কর। তিনি বলেন, অতঃপর উভয়ের সুপারিশই কবুল করা হবে। (আহমদ)

ছ. সিয়াম আদায়কারি বিনা হিসেবে প্রতিদান লাভ করে থাকেন

সারা জাহানের সর্বশক্তিমান প্রতিফলক আল্লাহ নিজে যখন এ পুরস্কার দেবেন তখন কি পরিমাণে দেবেন? ইমাম আওযায়ী রহমতুল্লাহ আলাইহি এই হাদিসে ব্যাখ্যা করেছেন, আল্লাহ যে সে আমাদের কারিকে প্রতিদান দেবেন তা মাপ হবে না ওজন করা হবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

“প্রতিটি নেক আমলের জন্য দশ থেকে সাতশত গুণ পর্যন্ত সাওয়াব রয়েছে। তবে রোজার সাওয়াব ছাড়া। কারণ তা আল্লাহর জন্য। আর আল্লাহ তাআলা চান যা ইচ্ছা তা দান করতে পারেন।” (বুখারি)

জ. সিয়াম গুনাহ মাফের কারণ ও গুনাহের কাফফারা

সিয়াম হল অনেকগুলো নেক আমলের সমষ্টি। আর নেক আমল গুনাহ সমূহ মুছে দেয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:

সৎকর্ম অবশ্যই পাপ সমূহ মিটিয়ে দেয় (সূরা হুদ: ১১৪)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

"যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সওয়াবের আশায় রমজান মাসের রোজা পালন করল, তার অতীতের সব গুনাহ মাফ করে দেওয়া হবে।" (বুখারি)

বহু হাদিস রয়েছে যা প্রমাণ করে যে, নেক আমলকে বিভিন্ন ছোটখাট পাপের কাফফারা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ নেক আমলের কারণে গুনাহ গুলো আল্লাহ ক্ষমা করে দেন।

যেমন হাদিসে এসেছে:-

'মানুষ যখন পরিবার-পরিজন প্রতিবেশী ও ধন সম্পদের কারণে গুনাহ করে ফেলে তখন সালাত, সিয়াম, সদকা ও গুনাহ গুলোকে মিটিয়ে দেয়।' (বুখারী)

আর রমজান তো গুনা মাফ ও মিটিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে আরো বেশি সুযোগ দিয়েছে। হাদিসে এসেছে:-

'যে রমজান মাসে ঈমানের সাথে সিয়াম পালন করবে, তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।' (বুখারী)

ইহতিসাবের অর্থ হল: আল্লাহর পক্ষ থেকে পুরস্কার পাওয়া যাবে সন্তুষ্ট চিত্তে সিয়াম ও কিয়াম আদায় করা।

হাদিসে আরও এসেছে:-

'পাঁচ ওয়াক্ত সালাত, এক জুমা থেকে অপর জুমা এবং এক রমজান থেকে অপর রমজান হল মধ্যবর্তী সময় পাপের কাফফারা, যদি কবিরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা যায়।'(মুসলিম)

সিয়াম ছোট পাপগুলোকে মিটিয়ে দেয় আর তাওবা করে গুনাহ মাফ করা হয়।

আল্লাহ তায়ালা বলেন:- 'তোমাদেরকে যা নিষেধ করা হয়েছে তার মাঝে যা গুরুতর তা হতে বিরত থাকলে তোমাদের পাপ গুলো ক্ষমা করে দেব। এবং তোমাদের সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব। (সূরা নিসা ৩১)

এই আয়াত ও হাদিস দুটো দ্বারা প্রমাণিত হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ক্ষমার ওয়াদা করা হয়েছে তা তিনটি শর্ত সাপেক্ষ।

প্রথম: রমজানের সিয়াম পালন করতে হবে ঈমানের সাথে। আল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এবং সিয়াম যে একটি ফরজ ইবাদত এর প্রতি বিশ্বাস। সিয়াম পালনকারীকে আল্লাহ যে সকল পুরস্কার দেবেন তার প্রতি বিশ্বাস রাখা।

দ্বিতীয়: সিয়াম পালন করতে হবে ইহতিসাবের সাথে। ইহতিসাবের অর্থ আল্লাহর পক্ষ থেকে সাবাব ও পুরস্কার আশা করা, তাকে সন্তুষ্ট করতেই সিয়াম পালন করা, আর সিয়ামকে বোঝা মনে না করা।

তৃতীয়: কবিরা গুনাহ থেকে দূরে থাকতে হবে। কবিরা গুনাহ ঐ সকল পাপকে বলা হয় যেগুলো ব্যাপারে ইহকালীন শাস্তির বিধান দেয়া হয়েছে। পরকালের শাস্তির ঘোষণা রয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তার রাসূলের পক্ষ থেকে লানত (অভিসম্পাত) বা রোদের ঘোষণা রয়েছে। যেমন শিরক করা, সুদ খাওয়া, এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা, ব্যভিচার করা, জাদু-টোনা, অন্যায় হত্যা, মাতাপিতার সাথে দুর্ব্যবহার, আত্মীয়তার সম্পর্কছেদ, মিথ্যা সাক্ষ্য, মিথ্যা মামলা, মাদক সেবন, ধোঁকাবাজি, মিথ্যা শপথ, অপবাদ দেয়া, গীবত বা বড় দোষচর্চা, চোগলখরি, সত্য গোপন করা-ইত্যাদি।

সিয়ামের আদব সমূহ

আদব হলো মানুষের জীবনের সৌন্দর্য। ইবাদত-বন্দেগির আদপ সমূহ ইবাদতকে উজ্জ্বল ও স্বচ্ছ করে দেয়। তাই প্রত্যেকটি ইবাদতে রয়েছে কিছু আদব-কায়দা বা শিষ্টাচার। কিছু আদব হলো অবশ্য পালনীয় যা বাস্তবায়ন না করলে ইবাদতটি গ্রহণযোগ্য হবে না, আর কিছু হলেও মুস্তাহাব অর্থাৎ যা পালন করলে ইবাদতটি পরিপূর্ণ সহায়ক হয় এবং ইবাদতের মাঝে কোন ত্রুটি হয়ে গেলে তা কাটিয়ে ওঠা যায় ও পরিপূর্ণ পাওয়া যায়। তাই আমরা এখানে সিয়ামের কতিপে আদব নিয়ে আলোচনা

করব। আমরা যদি আদব সমূহ মান্য করে সিয়া মাথায় করতে পারি, তাহলে আল্লাহর ফজলে আমরা সিয়ামের পূর্ণ সওয়াব লাভ করতে সক্ষম হব।

১. ইসলামকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে অনুসরণ করা

সিয়াম পালনকারী তো বটেই প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হল আল্লাহ যা কিছু আদেশ করেছেন তা পালন করা। আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তার প্রত্যেকটি বর্জন করা। এর নামই হল ইসলাম বা স্রষ্টার কাছে মানুষের পূর্ণ আত্মসমর্পণ। একজন মুসলিম তেমন কখনো নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণকরতে পারে না, তেমনি অন্য মানুষের খেয়াল-খুশি বা তাদের রচিত বিধানের অনুগত হতে পারে না। যদি হয়, তবে তা স্রষ্টার কাছে আত্মসমর্পণ করা হল না। যদি এভাবে আল্লাহর বিধান অনুসারে জীবনকে পরিচালিত করা যায়, তাকেই বলা হবে পরিপূর্ণ ইসলাম। আর পরিপূর্ণ ইসলামে প্রবেশ করতে আল্লাহর রাব্বুল আলামীন আদেশ করেছেন মানুষকে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:-

'হে মুমিনগণ! তোমরা সর্বাত্মকভাবে ইসলামে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।'(সূরা বাকারা: ২০৮)

ইসলামকে পূর্ণাঙ্গভাবে অনুসরণ করার নামই হলো তাকওয়া। যে তাকওয়া অবলম্বন করতে আল্লাহ পবিত্র কুরআনে বার বার নির্দেশ দিয়েছেন। এই তাকওয়ার দাবি হল, আল্লাহর আনুগত্য করতে হবে বাধ্য হওয়া যাবে না। তাকে স্মরণ করতে হবে ভুলে যাওয়া যাবে না। তার প্রতি কৃতজ্ঞ হতে হবে, অকৃতজ্ঞ হওয়া যাবে না। ঈমানদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য হলো শিরক ও রিয়া মুক্ত থেকে খালেস দিলে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ইবাদতসমূহ সম্পাদন করা। এর মাঝে সর্বশ্রেষ্ট হলো পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সালাত বাদ দিয়ে সিয়ামের কি মূল্য আছে? দৈনিক পাঁচবার ছাড়া আদায় করতে হবে জামাতের সাথে। জামাতের সাথে সালাত আদায়ের মাধ্যমে মুনাফিক থেকে মুক্তি সনদ নিতে হবে। এরপর যথা সময় যাকাত আদায় করতে হবে। সত্যিকারের হকদারকে যাকাত প্রদান করতে হবে। এমনিভাবে যে সামর্থ্য রাখে তাকে হজ ও ওমরাহ আদায় করাতে হবে। সাথে সাথে উত্তম চরিত্রের সকল আচরণ করতে হবে। মাতা পিতার

সাথে ভালো ব্যবহার করতে হবে। আত্মীয় স্বজনের সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে। প্রতিবেশীর সাথে সদাচরণ সাধ্যমত সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখার দায়িত্ব পালন করতে হবে। মানুষের অধিকার যথাযথভাবে আদায় করতে হবে।

২. সকল প্রকার অন্যায় থেকে বিরত থাকা

রমজানে সকল প্রকার অন্যায় থেকে বিরত না থাকলে সিয়াম কবুলের বিষয়টা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। অনেককে দেখা যায় সিয়াম পালন করে অযথা কথা-বার্তা, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সে খবর রাখে না যে, এ সকল অন্যায় কাজ-কর্ম সিয়ামের প্রতিদান লাভে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাদের ব্যাপারেই হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:-

'অনেক সিয়াম পালনকারী আছে যারা উপোস থাকা ছাড়া আর কিছু পায় না। আর অনেক রাত জাগা সালাত আদায়কারী আছে যারা রাত্রি-জাগরণ ব্যতীত আর লাভ করে না।' (দারামী)

আরেকটি হাদিসে রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:-

'সিয়াম হল ঢাল। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সিয়াম পালন করবে সে যেন অশ্লীল আচরণ থেকে বিরত থাকে। যদি তার সাথে কেউ ঝগড়া বিবাদ কিংবা মারামারিতে লিপ্ত হতে চায় তবে সে তাকে যেন বলে দেয় সে রোজাদার।' (মুসলিম)

৩. ইখলাস অবলম্বন করা

কোন কাজেই ইখলাস অবলম্বন করার অর্থ হলো কাজটা করার উদ্দেশ্য হবে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির অর্জন। এছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারবে না। শুধু সিয়াম নয় এই ইখলাস ব্যতীত কোন আমল কবুল হবে না। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন:-

'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠ ভাবে তার ইবাদত করতে এবং সালাত কায়েম করতে ও যাকাত দিতে, এটাই সঠিক দীন ।' (সূরা বাইয়েনা: ৫)

আর সিয়াম পালনে ইখলাসের বিষয়টা বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন:- 'যে রমজান মাসে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে সিয়াম পালন করবে তার অতীতের গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে।' (বুখারী ২০১৪)

এ হাদীসে ইহতিসাব শব্দ এসেছে। এর অর্থ হল ইখলাসের সাথে সিয়াম পালন করতে হবে। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন ও তার কাছ থেকে প্রতিদানের আশা করার নাম হল ইহতিসাব।

৪. সুন্নতে নবীর অনুসরণ

কোন আমল-তা যত ইখলাসের সাথে সম্পাদনা করা হোক না কেন, যদি আল্লাহ রাসুলের নির্দেশিত পদ্ধতিতে আদায় করা না হয় তবে তা কবুল হবে না। বরং তা আল্লাহর দরবার থেকে প্রত্যাখিত হবে।

যেমন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন-

'যে এমন আমল করবে তার প্রতি আমাদের দ্বীনের নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।'(মুসলিম ৪৫৯০)

'যার প্রতি আমাদের দিনের নির্দেশ নেই'-কথাটার অর্থ হলো যা আমাদের সুন্নাহর দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এমন ধরনের আমল যতই আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের নিয়ত করা হোক আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে অনুমোদিত না হওয়ার কারণে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। অতএব ধর্মীয় আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার দুটো শর্ত। তা হলো: এক, কাজটি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে করতে হবে। দুই, কাজটি আল্লাহর রাসূলের পথ নির্দেশিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করতে হবে। কাজটি যদি আল্লাহর রাসূলের নির্দেশিত পদ্ধতিতে সম্পাদন করা না হয় বা এই কাজে তার অনুমোদন প্রমাণ না থাকে, তাহলে কাজটি কোনো সওয়াব অর্জিত হবে না। বরং গুনাহ হবে।

৫. সিয়াম ভঙ্গের সহায়ক বিষয়গুলো পরিহার করে চলা

সিয়াম পালনকারীকে সিয়াম ভঙ্গের কারণ হতে পারে এমন সকল কাজ থেকে সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষ করে, স্বামী-স্ত্রীর আলিঙ্গন, চুম্বন বা এক কাঁথা-কম্বলের নীচে শয়ন ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা উচিত। এসব কাজ যদিও সিয়াম অবস্থায় করা অনুমোদিত আছে, তবে দেখা গেছে এসব কাজ করতে যেয়ে অনেকে সমস্যায় পড়ে গেছে, ফলে সিয়াম ভঙ্গ হয়ে গেছে।

প্রতিটি বিষয়ের একটি সীমানা আছে, এ সীমা যাতে অতিক্রম না হয়ে যায় এ লক্ষ্যে সতর্কতা অবলম্বনের জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে। যদিও সীমানা পর্যন্ত যাওয়া বৈধ কিন্তু সাবধানতা অবলম্বন বিধেয়। মনে রাখতে হবে রমজানের দিনের বেলা সিয়াম ভেঙে ফেলা একটি কবিরা গুনাহ। 'আমি নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি' বা 'এমনটি হবে বুঝতে পারিনি' বলে কবিরা গুনাহ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। এ ধরনের কথা কখনো যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না।

৬. ভয় ও আশা পোষণ করা

"প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হল, সিয়াম-সালাতসহ সকল ইবাদত সঠিক পদ্ধতিতে আদায় করা। কিন্তু তার জানা থাকে না যে, তার এ সালাত ও সিয়াম আল্লাহ কবুল করেছেন না প্রত্যাখ্যান করেছেন। অতএব তার সর্বদা এ ভয় থাকা উচিত যে, হয়তো আমি আমার ইবাদত-বন্দেগী এমনভাবে আদায় করতে পারিনি যেভাবে আদায় করলে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। ফলে আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান হয়তো পাব না। আবার এ আশাও পোষণ করা উচিত যে, আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা করে আমার ইবাদত-বন্দেগী কবুল করে আমাকে প্রতিদান দেবেন। এ অবস্থার নাম হল 'আল-খাওফ ওয়ার রজা' অর্থাৎ 'ভয় ও আশা।' এটা ইসলামের একটা গুরুত্বপূর্ণ আকীদা বিষয়ক পরিভাষা। মনে রাখতে হবে আল্লাহ তাআলা সকলের নেক আমল কবুল করেন না। যেমন তিনি বলেন:-

'অবশ্যই আল্লাহ মুত্তাকীদের কাজ কবুল করেন।' (সূরা মায়িদাহ ২৭)

হাদিসে এসেছে আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু নিম্নোক্ত আয়াতের অর্থ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কে জিজ্ঞেস করলেন:-

'যারা তাদের যা দান করার তা দান করে ভীতকম্পিত হৃদয়'- আল্লাহ এই কথা কাদের জন্য বলেছেন, যারা মদ্যপান করে, চুরি করে তাদের জন্য? তিনি উত্তর বললেন: না, হে সত্যবাদীর কন্যা! তারা হলো যারা সিয়াম পালন করে, সালাত আদায় করে, দান-সদকা করে সাথে সাথে এ ভয় রাখে হয়তো আমার এই আমলগুলো আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না। তারাই দ্রুত সম্পাদন করে কল্যাণকর কাজ এবং তারা তাতে অগ্রগামী।' (তিরমিজি)

বর্নিত আয়াত ও হাদিস দ্বারা স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ ওই সকল মুমিনদের প্রশংসা করেছেন যারা নেক আমল করে 'কবুল হবে কি না' এরকম একটা ভয় পোষণ করে। এবং আমল আরো সুন্দর করার চেষ্টা করে। কিন্তু এভাবে যেন আবার মানুষের নৈরাশ্যবাদী না করে। কোন অবস্থাতেই কোন মুসলিম আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত থেকে নিরাশ হতে পারে না। আল্লাহর সম্পর্কে নৈরাশ্যবাদী হওয়া একটা কুফরী। নেক আমল কবুল হওয়ার ব্যাপারে প্রবল আশাবাদী হতে হবে কিন্তু এই আশাবাদী মনোভাব যেন অহংকার ও আত্মতৃপ্তিতে ফেলে না দেয় যে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। অহংকার ও আত্মতৃপ্তি নেক আমল কে বাতিল করে দেয়। অনেক সময় অলসতা নিয়ে আসে। অপরদিকে ভয় মানুষকে তৎপর ও কর্মঠ হতে সাহায্য করে। তাই সকলের উচিত সকল প্রকার নেক আমল করতে হবে ভয়ও আশা নিয়ে শুধু ভয় অথবা শুধু শুধুই পাওয়ার আশায় নাই নয়।

৭. সাহরী খাওয়া

সিয়াম পালনের জন্য সেহরি খাওয়া সুন্নত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:-

'তোমরা সাহারি খাও, কারণ সাহরীতে বরকত রয়েছে।'(বুখারী ১৯২৩)

সাহারি না খেয়ে সিয়াম পালন করলে যখন সিয়াম আদায় হবে। তবে খাবেন কেন?

ক. সাহরী খাওয়া সুন্নত। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম সাহরী খাওয়ার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

খ. ক্ষুধা-পিপাসা মোকাবিলা করার জন্য।

গ. সাহরী খেলে সিয়াম পালনে কষ্ট হয় কম ও সিয়াম পালন সহজ হয়।

ঘ. ইহুদী ও খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধাচারণ করা। কারণ তারা সিয়াম পালন করতে সাহরী খায় না। যেমন,

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:-

'আমাদের ও ইহুদি খ্রিস্টানদের সিয়ামের মাঝে পার্থক্য হল সাহরী খাওয়া।' (মুসলিম)

ঙ. সাহরীর মাধ্যমে শেষ রাতে তাহাজ্জুদ ও কিয়ামুল লাইল করার সুযোগ সৃষ্টি হয়।

চ. ফজরের সালাত জামাতের সাথে আদায় করা নিশ্চিত হয়। তাই সাহারি খাওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন। তবে সাহরীর খাবার হালকা হওয়া ভালো। এমন বেশি খাওয়া উচিত নয়, যাতে দিনের বেলা কাজকর্মে অলসতা দেখা দেয়। যে কোন হালাল খাবার সাহরীতে গ্রহন করা যায়। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু ওয়া সাল্লাম বলেছেন:-

'মুমিনের উত্তম সাহরী হল খেজুর।' (আবু দাউদ ২৩৪৭)

তিনি আরো বলেন:-

'সাহরী হল একটি বরকতময় খাদ্য, তাই তার তোমরা ছেড়ে দিও না। এক ঢোক পানি দ্বারা হলেও সাহরী করে নাও। কেননা আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ও ফেরেশতাগণ সাহরীতে অংশগ্রহণকারীদের জন্য দোয়া করতে থাকেন।' (আহমদ)

৮. দেরি করে সাহারি খাওয়া

সাহরীর অর্থ হল যা কিছু রাতের শেষ ভাগে খাওয়া হয়। সুন্নত হল দেরি করে সাহরী খাওয়া। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বদা শেষ সময়ে সাহরী খেতেন। ফজরের ওয়াক্ত আসার পূর্ব-ক্ষণে সাহরী খেলে সিয়াম পালন অধিকতর সহজ হয়, ফজরের সালাত আদায় করার জন্য দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করে কষ্ট করতে হয় না।

সতর্কতা অবলম্বন করে ফজরের অনেক আগে সাহরী শেষ করা সুন্নত নয়। সাহরীর সময় শেষ হলো কি-না তা জানবেন নিজের চোখে পূর্বাকাশের শুভ্রতা দেখে, অথবা ক্যালেন্ডার ও ঘড়ির মাধ্যমে সূক্ষ্ম হিসাব করে কিংবা নির্ভরযোগ্য মুয়াজ্জিনের ফজরের আযান শুনে।

৯. সেহরির সময়কে সুযোগ মনে করে কাজে লাগানো

সাহরীর সময় অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ একটি সময়। এ সময় জাগ্রত হওয়ার কারণে আল্লাহ যা পছন্দ করেন এমন অনেক ভালো কাজ করা যায়। যেমন তিনি মুমিনদের প্রশংসায় বলেছেন:-

'তারা শেষ রাতে (সাহরীর সময়) ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা জারিয়াত ১৮)

তিনি ওই আয়াতে ওই সকল জান্নাতবাসি মানুষদের প্রশংসা করেছেন যারা শেষ রাতে দোয়া প্রার্থনা করে ও ক্ষমা চায় আল্লাহর কাছে। এর মাধ্যমে তারা যে জান্নাত লাভ করবে এর সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। সাহরীর সময়টা এমন একটি সময় যখন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন দুনিয়া নিকটতম আকাশ অবতরণ করেন। যে সকল মানুষ তখন তার প্রতি আগ্রহী হয়ে সালাত ও দোয়া-প্রার্থনা করে, তিনি তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। যেমন রাসুলুল্লাহ সাঃ বলেছেন:-

'আমাদের মহান প্রতিপালক আল্লাহ রাব্বুল আলামীন প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন। তখন মানুষদের উদ্দেশ্য করে বলেন যে আমার কাছে দোয়া করবে আমি তাতে সাড়া দেব। যে আমার কাছে চাইবে আমি তাকে দান করব ও যে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব।' (বুখারী)

অতএব সাহরীর সময় হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি দান- প্রতিদানের সময়। এ সময়ে সে ব্যক্তিই তার সামনে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেন যিনি আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ব ভালোভাবে অনুধাবন করতে পেরেছেন। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের নিয়তকে বিশুদ্ধ করেছেন। অনেক মানুষ এমন আছেন যারা এ সময় জাগ্রত হয়ে খাওয়া-দাওয়া অনেক কাজ সমাধা করেন কিন্তু দোয়া-প্রার্থনা, ইস্তেগফার,

তাহাজ্জুদের সালাত আদায় করার সুযোগ করে নিতে পারেন না। শেষ রাতের সালাত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেছেন:-

' হে মানবসকল! তোমরা সালামের প্রচলন করো। অন্যকে খাবার দাও। আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখ আর রাতে যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে তখন তোমরা সালাত আদায় কর তাহলে শান্তির সাথে জান্নাত যেতে পারবে। (দারামী)

আরো যে সকল কাজ করা উচিত,

ইফতারি করতে বিলম্ব না করা, যে সকল খাদ্য দ্বারা ইফতার করা মুস্তাহাব, ইফতারের সময় দোয়া করা, বেশি করে ভালো ও কল্যাণমূলক কাজ করা এবং কুরআন পাঠ করা, ইবাদত বন্দেগীতে তাওফিক দানের ব্যাপারে আল্লাহর অনুগ্রহ অনুধাবন করা, দরিদ্র ও অসহায় সম্বলহীনদের প্রতি মমতা ও তাদের সেবা করা।

সিয়ামের হিকমত, লক্ষ্য এবং উপকারিতা

মহান আল্লাহর ৯৯ এর অধিক সুন্দর নামাবলীর অন্যতম নাম হল ‘আল-হাকীম।’ ‘আল-হাকীম’ অর্থ হিকমত-ওয়ালা, বিজ্ঞানময়, প্রজ্ঞাময়। আর হিকমত ও প্রজ্ঞা হল সর্বকর্ম যথাযোগ্যভাবে নৈপুণ্যের সাথে সম্পাদন করা। মহান আল্লাহর এই নামের দাবী এই যে, তিনি যা কিছু সৃষ্টি করেছেন অথবা মানুষের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন তার প্রত্যেকটার পশ্চাতে আছে পরিপূর্ণ যুক্তি ও হিকমত; তা কেউ বুঝতে সক্ষম হোক অথবা অক্ষম।

যে রোযা আল্লাহ তাআলা বান্দার উপর ফরয ও বিধিবদ্ধ করেছেন তার মাঝে রয়েছে অভাবনীয় যৌক্তিকতা ও অচিন্তনীয় উপকারিতা। যেমনঃ-

১। রোযা হল এক এমন ইবাদত, যার মাধ্যমে বান্দা প্রভুর নৈকট্যলাভ করতে সক্ষম হয়। এতে সে প্রকৃতিগতভাবে যে জিনিস ভালোবাসে তা বর্জন করে; বর্জন করে সকল প্রকার পানাহার ও যৌনক্রিয়া। আর এর মাধ্যমে সে নিজ প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা

করে। আশা করে পরকালের সাফল্য ও বেহেশতলাভ। এতে এই কথাই স্পষ্ট হয় যে, সে নিজের প্রিয় বস্তুর উপর প্রভুর প্রিয় বস্তুর প্রাধান্য দেয় এবং ইহকালের জীবনের উপর পরকালের জীবনকেই শ্রেষ্ঠত্ব দেয়।

২। রোযাদার যথানিয়মে রোযা পালন করলে রোযা তাকে মুত্তাকী ও পরহেযগার বানাতে সহায়ক হয়। তার জীবন পথে তাকওয়া ও পরহেযগারীর আলো বিচ্ছুরিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হল, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের উপর ফরয করা হয়েছিল। যাতে তোমরা পরহেযগার হতে পার। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৩)

সুতরাং রোযাদার রোযা রেখে তার জীবনের প্রত্যেক চিন্তা, কথা ও কর্মে 'তাকওয়া' আনবে -এটাই বাঞ্ছিত। আর 'তাকওয়া' হল সেই আল্লাহ-ভীতির নাম, যার মাধ্যমে বান্দা তাঁর সকল আদেশ যথাসাধ্য পালন করে চলবে এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ কর্ম থেকে সুদূরে থাকবে। বলা বাহুল্য, এটাই হল রোযার মহান উদ্দেশ্য ও প্রধান লক্ষ্য। পানাহার ও যৌনক্রিয়া নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে মানুষকে বৃথা কষ্ট দেওয়া রোযার উদ্দেশ্য নয়। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "যে ব্যক্তি রোযা রেখে মিথ্যা কথা ও তার উপর আমল ত্যাগ করতে পারল না, সে ব্যক্তির পানাহার ত্যাগ করার মাঝে আল্লাহর কোন প্রয়োজন নেই।

৩। রোযা আত্মাকে তরবিয়ত দান করে, চরিত্রকে সভ্য ও আদর্শভিত্তিক করে গড়ে তোলে এবং রোযাদারের আচরণে উৎকৃষ্টতার স্থায়িত্ব আনয়ন করে। মুসলিমের সবভাব-প্রকৃতিতে রোযা গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রোযার সংশোধনী বার্তা তার হৃদয়-মনে তাসীর রেখে যায়। রোযাদারের অন্তরে এমন জাগরণ সৃষ্টি করে এবং তার মনের দুয়ারে এমন অতন্দ্র প্রহরী খাড়া করে দেয় যে, সে নিজের আত্মাকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় এবং এই প্রহরীর চোখে ফাঁকি দিয়ে কোনও নৈতিকতা-বিরোধী কর্ম করতে ইচ্ছা ও চেষ্টাও করতে পারে না।

এটা কি করে হতে পারে যে, রোযাদার তার প্রতিপালকের নিকট সত্যবাদিতার পরিচয় দেবে, অথচ মানুষের সঙ্গে মিথ্যা বলবে? নিজের রোযায় আন্তরিকতা রাখবে, অথচ নিজ সমাজের সঙ্গে ধোকাবাজী ও কপটতা প্রদর্শন করবে? ইখলাস ও আন্তরিকতা একটি সামগ্রিক বস্তু; যা ভাগাভাগি হয় না। যার সর্বোচ্চ পর্যায় ও সারাংশ হল সৃষ্টিকর্তা অন্তর্যামী আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। সুতরাং যে ব্যক্তির আল্লাহর সাথে আন্তরিকতা থাকবে, সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে অসম্ভব যে, সে মানুষকে ধোকা দেবে, আমানতে খেয়ানত করবে, অপরকে ঠকিয়ে খাবে, চুরি করবে, যুলম করবে অথবা অপরকে কষ্ট দেবে। পক্ষান্তরে যদি কারো চক্রান্তে পড়ে বা ভুলক্রমে এ ধরনের কোন পাপ করেই বসে, তাহলে সাথে সাথে সে সুপথে ফিরে আসে, আল্লাহর নিকট তওবা করে, অনুতপ্ত হয়, লজ্জিত হয় সীমাহীন।

সুতরাং রোযা হল একটি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুচরিত্র গঠনের উপকরণ এবং তা সমৃদ্ধকরণের জন্য আভ্যন্তরীণ এক মৌলিক উপাদান। আর বিদিত যে, বাহ্যিক সৌন্দর্যের বাহার কোন মূল্য রাখে না; যদি না অভ্যন্তর সুদৃঢ় ও মজবুত হয়। তাই রোযাদারের জীবনে তার আখলাক-চরিত্র স্থায়িত্ব, স্থিতিশীলতা, বর্ধনশীলতা ও শ্রীবৃদ্ধিশীলতার গুণাবলী গ্রহণ করে থাকে। কারণ, তার সকল আচরণ ভিতর ও বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত ও সুরক্ষিত হয়ে যায়।

৪। রোযা রোযাদারের আচার-ব্যবহারকে সুন্দর করার কাজে বড় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে। পূর্ণ একটি মাস ধরে তাকে পাপ থেকে দূরে রাখে, নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তু থেকে নিরাপদে রাখে। বরং রোযা তাকে এক মহান ইবাদতে মশগুল রাখে, হীনতা ও নীচতা হতে রক্ষা করে, প্রত্যেক নোংরামীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। সুতরাং সে না চুগলী করে, না গীবত। না মিথ্যা বলে, না অশ্লীল। না ফিতনা সৃষ্টি করে, না ফাসাদ। না অসার বকে, না ফালতু। কোন প্রকারের পাপাচরণ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না। ফলে প্রকৃত রোযাদার রোযার পরেও একটি নিষ্পাপ ও পবিত্র মানুষের মত যাবতীয় সচ্চরিত্রতার অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে সুখময় জীবন-যাপন করতে পারে।

৫। রোযা মন ও প্রবৃত্তিকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করার অনুশীলন দেয়। জিতেন্দ্রিয় ও সংযমী হতে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে রোযাদার তার মন ও প্রবৃত্তিকে সেই কাজে ব্যবহার করতে পারে; যাতে ইহ-পারলৌকিক সকল প্রকার মঙ্গল ও কল্যাণ নিহিত আছে। আর এমন আচরণ ও কর্ম থেকে তাকে দূরে রাখে; যাতে সে একটি ইন্দ্রিয়সেবী ও পাশবিক গুণসম্পন্ন মানুষ বলে পরিচিত হতে পারে; যেখানে সে কামনা-বাসনা ও লালসার প্রবণতা থেকে তাকে রুখতে সক্ষম হয় না।

সুতরাং রোযা সেই মন্দপ্রবণ আত্মার বিরুদ্ধে লড়ায়ে বিজয়ী হতে মুসলিমকে সার্বিক সহযোগিতা করে, যে আত্মা সর্বদা হারাম কাজে লিপ্ত হতে চায়, অবৈধভাবে কাম-লালসা চরিতার্থ করতে চায়। রোযা রোযাদারের ইচ্ছাশক্তিকে সর্বপ্রকার পাপ ও কুপ্রবৃত্তির স্পর্শ থেকে দূরে থাকার 'ট্রেনিং' দেয়। রোযার মাঝে রয়েছে আত্মসংযম এবং কুপ্রবৃত্তির দমন।

আধুনিক যুগের মানুষ অধিকাংশে নিজ কামনা-বাসনার কাছে বড় দুর্বল, কুপ্রবৃত্তি ও মন্দ-প্রবণ খেয়ালখুশীর বশীভূত। আর মনকে সবল ও সুদৃঢ় করতে রোযা ছাড়া আর অন্য কোন উপায়-উপকরণ নেই। কারণ, রোযাদার অত্যন্ত ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর থাকা সত্ত্বেও পানাহার বর্জন করে থাকে। আর নিঃসন্দেহে এ কাজে আত্মবিশ্বাস ও আত্মনিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা সৃষ্টি হয় এবং সর্বকাজে মনোবল প্রবল ও সুদৃঢ় হয়।

৬। রোযা রোযাদারকে কুঅভ্যাসের দাসত্ব থেকে মুক্তিদান করে। এমন বহু মানুষ আছে, যারা এমন বহু নোংরা অভ্যাসে অভ্যাসী হয়ে পড়ে এবং তার ফাঁদ থেকে বের হওয়ার কোন পথ খুঁজে পায় না। কিন্তু রোযা এলে তাদেরকে দেখা যায় যে, তারা তাদের সে সমস্ত কুঅভ্যাসকে পরিপূর্ণরূপে বর্জন করে ফেলেছে।

বলা বাহুল্য, এটাই হয় তাদের জন্য সুবর্ণ-সুযোগ; যার মাঝে তাদের সেই সকল মন্দ অভ্যাসের পঞ্জা থেকে নিজেদেরকে সহজ উপায়ে স্বাধীন করে নিতে পারে, যে সকল অভ্যাস তাদের মানসিক দুশ্চিন্তা ও ব্যাধির একমাত্র কারণ।

অতএব সেই সকল রোযাদারগণ যারা ধুমপানে অভ্যাসী; যাদের অবৈধ বিড়ি-সিগারেট বিনা ৩০ মিনিটও অতিবাহত হয় না, অথবা তা পান না পর্যন্ত পায়খানাও হয় না, যাদের দৈনিক ১ প্যাকেট সিগারেট পানে তাদের ৫০ বছর জীবনে প্রায় ১ লাখ ৮২ হাজার ৫০০ টাকা এবং ১৫২০৮ ঘ¦টা ২০ মিনিট সময় অপচয় হয়, তাদের উচিৎ, রোযার এই পবিত্র অবসরে এই শ্রেণীর 'বিষপান' চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করা। কারণ, এ 'সুখটান' এমন 'অগ্নিবাণ' যে, তা মানুষের সুসবাস্থ্য, দেহ, অর্থ, দ্বীন, দুনিয়া ও আখেরাতের জন্য বড় ক্ষতিকর। যে মানুষ ১২/১৩ ঘ¦টা আল্লাহর ওয়াস্তে তা বর্জন করে থাকতে পারে, সে মানুষ আল্লাহরই ভয়ে বাকী সময় পান না করলেও থাকতে পারবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কোন জিনিস বর্জন করবে, সে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছায় তার চাইতে উত্তম জিনিস অর্জন করবে। এটাই হল আল্লাহর রীতি। পরন্তু এ কোনক্রমেই উচিৎ নয় যে, রোযাদার সারাদিন হালাল জিনিস না খেয়ে রোযা রেখে পরিশেষে হারাম জিনিস দিয়ে রোযা খুলবে!

৭। রোযার মাঝে রয়েছে আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান রাখার সবিশেষ প্রশিক্ষণ। কারণ, রোযা হল গুপ্ত ইবাদত। যেহেতু মানুষ এ ইবাদতে মুনাফেকী রাখতে পারে না। ইচ্ছা করলে সে গোপনে খেতে বা পান করতে পারে, অথবা উপবাস থেকেও নিয়ত ভেঙ্গে ফেলতে পারে। সুতরাং নিছক আল্লাহর প্রতি সুদৃঢ় ঈমান ও সত্য ভয় না থাকলে প্রকৃতরূপে রোযা রাখা যায় না।

বলা বাহুল্য, রোযা হল এমন একটি আন্তরিক ইবাদত, যা বান্দা ও প্রভুর মাঝে একান্ত গুপ্ত। অতএব গোপনে পানাহার করার সামর্থ্য ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তা না করা এই কথাই প্রমাণ করে যে, সে বান্দা নিঃসন্দেহে এই বলে অটল বিশ্বাস রাখে যে, মহান আল্লাহ তার গোপন সব কিছুই দেখেন ও জানেন। আর এখান থেকেই রোযাদারের মনে ইবাদতে সততা ও আমানতদারী সৃষ্টি হয়। তাইতো আল্লাহ তাআলা রোযাকে পৃথক বৈশিষ্ট্য দান করেছেন; বান্দার প্রত্যেক আমলের সওয়াবকে ১০ গুণ থেকে ৭০০ গুণ; বরং আরো অনেক অনেক গুণ বর্ধিত করে থাকেন। কিন্তু রোযা নয়। রোযাকে

তিনি নিজের জন্য খাস করে নিয়েছেন। আর তার সওয়াবের পরিমাণ যে কত, তা তিনি ছাড়া অন্য কেউ জানে না।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "আল্লাহ তাআলা বলেন, আদম সন্তানের প্রত্যেক আমল তার নিজের জন্য; তাতে তার সওয়াব ১০ থেকে ৭০০ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু রোযা নয়। রোযা হল আমার জন্য। আর আমি নিজে তার প্রতিদান দেব।'

৮। রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি করে। কারণ, সে আল্লাহর নিকট আখেরাতে যে সওয়াব ও প্রতিদান আছে তা পাওয়ার আশায় আগ্রহান্বিত হয়ে পার্থিব কিছু সুখ-উপভোগ থেকে বিরত থাকে। সে যে নিক্তিতে লাভ-লোকসান ওজন করে থাকে তা হল পারলৌকিক। রোযার দিনে পানাহার ও যৌনসুখ শুধু এই আশায় পরিহার করে যে, এতে সে আল্লাহর সন্তুষ্টি পাওয়ার সাথে সাথে কিয়ামতের দিন উত্তম প্রতিদান পাবে। সুতরাং এইভাবে রোযা রোযাদারের মনে পরকালের প্রতি ঈমান বদ্ধমূল করে, পরলোকের সাথে অন্তরকে জুড়ে রাখে এবং ক্ষণস্থায়ী এই ধরাধামের পার্থিব ভোগ-বিলাসে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি করে; যে ভোগ-বিলাস অনেক সময় মানুষকে আখেরাতের কথা বিস্মৃত করে এই ধারণা দেয় যে, সে পৃথিবীতে অমর ও চিরকাল থাকবে।

৯। রোযা পরিপূর্ণরূপে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর পূর্ণ দাসত্ব করার কথা শিক্ষা দেয়। রোযা মুসলিমকে প্রকৃত দাসত্বের অনুশীলন দেয়। তাই তো সে রাতের বেলায় খায়, পান করে। কারণ, তার প্রভু যে বলেছেন,

(وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ)

অর্থাৎ, আর তোমরা পানাহার কর, যতক্ষণ পর্যন্ত না (রাতের) কালো অন্ধকার থেকে ফজরের সাদা রেখা তোমাদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

বলা বাহুল্য, এ জন্যই ইফতার ও সেহরীর সময় খাওয়া হল সুন্নত ও মুস্তাহাব এবং না খেয়ে একটানা পরপর কয়েকদিন রোযা রাখা মাকরূহ । অতএব রোযা রাখার জন্য সেহরী খাওয়া এবং রোযার শেষে ইফতারী খাওয়া হল এক প্রকার আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর নির্দেশের আনুগত্য।

তদনুরূপ ফজর উদয় হলে মুসলিম পানাহার সহ সেই সকল বস্ত ও বিষয় থেকে দূরে থাকে, যাতে রোযা নষ্ট করে ফেলে। আর এর মাঝেও সে একমাত্র আল্লাহরই দাত্ব ও আনুগত্য করে। কারণ, তিনি বলেন,

(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)

অর্থাৎ, অতঃপর তোমরা রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৭)

সুতরাং এইভাবে মুসলিম মহান আল্লাহর পূর্ণ দাসত্ব ও আনুগত্যের উপর দীর্ঘ প্রশিক্ষণ লাভ করে থাকে।

১০। রোযা মুসলিমের জন্য আল্লাহর এক প্রকার রহমত, করুণা ও অনুগ্রহ। মহান আল্লাহ মুসলিম জাতির প্রতি অনুগ্রহ ও করুণা প্রদর্শন করেই রোযা ফরয করেছেন। কারণ, এরই মাধ্যমে তিনি মুসলিমের পাপরাশি মার্জনা করে থাকেন, তার মর্যাদা উন্নীত করে থাকেন এবং বহুগুণ হারে তার সওয়াব বৃদ্ধি করে থাকেন।

১১। রোযা হল গোনাহের কাফ্ফারা। কারণ, নেকীর কাজ গোনাহর কাজের গোনাহ নাশ করে দেয়। আর রোযা হল বড় নেকীর কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ)

অর্থাৎ, নিশ্চয় পুণ্যরাশি(সওয়াবের কাজ)পাপরাশিকে দূরীভূত করে। (কুরআনুল কারীম ১১/১১৪)

আর প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘মানুষের পরিবার, ধন-সম্পদ ও প্রতিবেশী সংক্রান্ত পাপরাশিকে নামায, রোযা এবং সদকাহ মোচন করে দেয়। অর্থাৎ, মুসলিম যে গোনাহ তার পরিবারকে অন্যায়ভাবে উচ্চবাচ্য করে, কষ্ট দিয়ে অথবা

কোন বিষয়ে তাদের প্রতি ত্রুটি ও অবহেলা প্রদর্শন করে, অথবা প্রতিবেশীকে কোন কথায় বা কাজে কোন প্রকার কষ্ট দিয়ে, অথবা আর্থিক কোন প্রকার ত্রুটি ঘটিয়ে অথবা অনুরূপ অন্যান্য সাগীরা (ছোট) গোনাহ করে থাকে, সে সবকে তার নামায, রোযা এবং দান-খয়রাত মোচন করে দেয়।

পরন্তু প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের আশা রেখে রমাযানের রোযা রাখে, তার পূর্বেকার সকল গোনাহ মাফ হয়ে যায়।

আবু হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ''কাবীরাহ গোনাহ না করলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায, এক জুমআহ থেকে অপর জুমআহ এবং এক রমাযান থেকে অন্য রমাযান -এর মধ্যবর্তীকালে সংঘটিত পাপসমূহের কাফফারা (প্রায়শ্চিত্ত)

তদনুরূপ রোযা হল কসম ভাঙ্গার কাফ্ফারা (জরিমানা)। (কুরআনুল কারীম ৫/৮৯) যিহারের কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ৫৮/৪) কোন মুসলিমকে বা চুক্তিবদ্ধ কোন যিম্মীকে ভুলবশতঃ হত্যা করে ফেলার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ৪/৯২) ইহরামে নিষিদ্ধ কর্ম করে ফেলার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬, ৫/৫) তামাত্তু' হজ্জের কুরবানী দিতে না পারলে তার কাফ্ফারা। (কুরআনুল কারীম ২/১৯৬) ইত্যাদি।

১২। রোযা রোযাদারের মনে ধৈর্য ও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। কষ্টে ধৈর্য ধারণ ও সহনশীলতা অবলম্বন করতে অভ্যাসী বানায়। রোযা তাকে তার প্রিয় বস্ত ব্যবহার বর্জন করতে ধৈর্যের শিক্ষা দেয়। যেমন শিক্ষা দেয় কাম-দমন ও মনের যথেচ্ছাচার দমন করার; যা নিশ্চয় সহজ কাজ নয়।

বলা বাহুল্য, রোযা পালনে রয়েছে ৩ প্রকার ধৈর্য। মহান আল্লাহর আনুগত্যে ধৈর্য, তাঁর হারামকৃত বস্তু পরিহার করার উপর ধৈর্য এবং তাঁর নির্ধারিত তকদীরের বালা-মসীবতের উপর ধৈর্য। এই ৩ প্রকার ধৈর্য যে বান্দার মাঝে একত্রিত হবে, সেই হবে ইহকালে পরম সুখী এবং পরকালে আল্লাহর ইচ্ছায় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। মহান আল্লাহ বলেন,

(إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ)

অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার ও সওয়াব দান করা হবে। (কুরআনুল কারীম ৩৯/১০)

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, ক্ষুৎ-পিপাসা ও যৌনক্ষুধায় ধৈর্যধারণ করাই হল ধৈর্যের শেষ পর্যায়। সুতরাং যে ব্যক্তি এই শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করতে পারঙ্গম হবে, সে ব্যক্তির জন্য অন্য শ্রেণীর ধৈর্য ধারণ করা সহজ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধৈর্য ধারণ করবে, সে ব্যক্তি লাভ করবে শুভপরিণাম।

মহান আল্লাহ বলেন,

(وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرّاً وَعَلانِيَةً وَيَدْرَأُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ- جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا)

‘ ‘যারা তাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টিলাভের জন্য ধৈর্যকষ্ট বরণ করে, যথাযথভাবে নামায পড়ে, আমি যে রুযী তাদেরকে দান করেছি তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে এবং যারা ভালো দ্বারা মন্দকে দূর করে- তাদেরই জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম; (আদ্ন) স্থায়ী বেহেশত, ওতে ওরা প্রবেশ করবে। (কুরআনুল কারীম ১৩/২২-২৩)

১৩। রোযা হল ঢালস্বরূপ; দোযখ থেকে রক্ষার ঢালস্বরূপ। একটি মাত্র রোযা জাহান্নামকে রোযাদার থেকে ৭০ বছরের পথ দূরে সরিয়ে দেয়। সুতরাং যে ব্যক্তি পূর্ণ রমাযান মাসের রোযা রাখে এবং প্রত্যেক মাসে ৩টি রোযা অথবা আরো অন্যান্য নফল রোযা রাখে, সে ব্যক্তি থেকে দোযখ কত বছরের পথ দূরে সরে যায় তা অনুমেয়।

১৪। রোযা হল চরিত্রহীনতা ও ব্যভিচার ইত্যাদি অশ্লীলতা থেকে ঢালস্বরূপ। রোযা রোযাদারকে অবৈধ যৌনাচার থেকে হিফাযতে রাখে, যেমন ঢাল মুজাহিদ (যোদ্ধা)কে শত্রুপক্ষের তীর ও তরবারির আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে।

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত, প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘‘হে যুবকদল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (বিবাহের অর্থাৎ স্ত্রীর ভরণপোষণ ও রতিক্রিয়ার) সামর্থ্য রাখে সে যেন বিবাহ করে। কারণ, বিবাহ চক্ষুকে সংযত করে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে। আর যে ব্যক্তি ঐ সামর্থ্য রাখে না, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, তা যৌনক্ষুধা উপশমকারী।

বলা বাহুল্য, যে যুবক বিবাহের খরচাদি বহন করতে সক্ষম নয়, সে যুবককে মহানবী এই নির্দেশ দিলেন যে, সে যেন তার কামক্ষুধা ও যৌন-উত্তেজনা প্রশমিত করতে রোযার সাহায্য নেয়। কারণ, রোযা উক্ত ক্ষুধা ও উত্তেজনা দমন ও নিবারণ করে। আর অনেকের অভিজ্ঞতা দ্বারা উক্ত নববী চিকিৎসা প্রমাণিত ও পরীক্ষিত যে, কামপীড়িত যুবকের জন্য যে কোনও সেব্য ঔষধ অপেক্ষা রোযাই হল উত্তম ও অব্যর্থ ঔষধ।

১৫। রোযা হল বেহেশগামী পথ। আবূ উমামাহ (রাঃ) জান্নাতে প্রবেশ করাবে এমন আমল প্রসঙ্গে যখন আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর নিকট নির্দেশ চাইলেন, তখন তিনি তাঁকে বললেন, ‘‘তুমি রোযা রাখ। কারণ, তার মত অন্য কোন আমল নেই। তাছাড়া মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) রোযাদারকে বেহেশ্তে ‘রাইয়ান’ নামক এক বিশেষ দরজা দিয়ে প্রবেশ করার সুসংবাদ দিয়েছেন। আর ‘রাইয়ান’ (তৃষ্ণাহীন) দ্বার আমল অনুযায়ী রোযাদারের জন্য বড় উপযুক্ত। কারণ, রোযা রাখার ফলে দুনিয়াতে সে পিপাসায় কাতর হয়। তাই তারই বিনিময়ে পরকালে ‘‘সেই দ্বারে যে প্রবেশ করবে সে (বেহেশ্তী পানীয়) পান করবে। আর যে ব্যক্তি একবার তা পান করবে, সে ব্যক্তি আর কোন কালেও পিপাসিত হবে না।

১৬। রোযা পালনের মাধ্যমে রোযাদার তার মহান প্রভুর সন্তুষ্টি লাভ করে থাকে। যার জন্য তার উপবাস-জনিত মুখের দুর্গন্ধও আল্লাহর নিকট কস্তুরী অপেক্ষাও অধিক সুগন্ধময় হয়! অথচ খালি পেটে থাকা অবস্থায় মুখ থেকে বের হওয়া ঐ দুর্গন্ধ কোন মানুষ পছন্দ করে না; বরং ঘৃণাই করে থাকে। কিন্তু তা মহান স্রষ্টার নিকটে অতি পছন্দনীয়। কারণ, এ গন্ধ তাঁরই আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে নির্গত হয়ে থাকে।

১৭। রোযাদার ব্যক্তির দুআ রোযা রাখা অবস্থায় কবুল হয়ে থাকে। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "তিন প্রকার দুআ আল্লাহর নিকট কবুল হয়ে থাকে; রোযাদারের দুআ, অত্যাচারিতের দুআ এবং মুসাফিরের দুআ।

১৮। রোযা কিয়ামতের ভীষণ বিচার দিনে রোযাদারের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে; বলবে, 'হে আমার প্রভু! আমি ওকে দিনের বেলায় পানাহার ও যৌনক্রিয়া থেকে বিরত রেখেছিলাম। সুতরাং ওর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ করে নাও।' অতঃপর মহান প্রভু তার সে সুপারিশ গ্রহণ করে নেবেন।

১৯। রোযা রোযাদারের জন্য ইহ-পরকালের খুশী ও সুখের হেতু। যেমন মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, "রোযাদারের জন্য রয়েছে ২টি খুশী; প্রথম খুশী হল ইফতার করার সময় এবং দ্বিতীয় খুশী হল প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাতের সময়।

রোযাদারের ইফতার করার সময় যে খুশী, তা হল সেই সুখ ও তৃপ্তির একটি নমুনামাত্র; যা মুমিন ব্যক্তি নিজ প্রভুর আনুগত্য ও তাকওয়ার মাধ্যমে অর্জন করে থাকে। আর প্রকৃতপ্রস্তাবে এটাই হল আসল সুখ। এই সুখ ও তৃপ্তি দুইভাবে অনুভূত হয়ে থাকেঃ-

(ক) আল্লাহ তাআলা ঐ ইফতারের সময় রোযাদারের জন্য পানাহার বৈধ করে দিয়েছেন। আর নিঃসন্দেহে মানুষের প্রকৃতি এই যে, (বিশেষ করে খিদে থাকা অবস্থায়) খাবার দেখলে মন আনন্দে নেচে ওঠে। আর এ জন্যই তা বর্জন করা হল আল্লাহর ইবাদত।

(খ) সে মুহূর্তে রোযাদার তার একটি রোযা সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং আল্লাহর তওফীক অনুযায়ী সে সেদিনকার রোযা ও ইবাদত যে পালন ও পূর্ণ করতে পারল, তারই খুশী তার মনকে আন্দোলিত করে তোলে।

পক্ষান্তরে সবচেয়ে বড় খুশী যা, তা রয়েছে পরকালে; যখন তাঁর সাথে সাক্ষাৎ হবে যাঁর জন্য রোযাদার রোযা রেখে থাকে।

২০। রোযা হল পরহেযগার ও নেক লোকদের ট্রেনিং-ময়দান; যার মাঝে আল্লাহর দেওয়া পৃথিবীর খেলাফতের দায়িত্ব পালন করার উপর নিজেদের কর্তব্যের বিভিন্ন ট্রেনিং নিয়ে থাকে। বলা বাহুল্য, রোযা দেহ-মনের জন্য একটি বড় রহমত। রোযার মাঝেই হৃদয় ও সকল চিন্তা-ভাবনা আল্লাহ তাআলার সাথে যুক্ত থাকে। সকল মনোবল তাঁর ভালোবাসা, আনুগত্য ও তাঁর পথে জিহাদের কাজে বর্ধিত ও সংবদ্ধ হয়ে থাকে। যার পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে এই যে, আল্লাহর বাণীই সমুন্নত হোক এবং কাফেরদের বাণী হোক অবনত; সে কাফের যেমনই হোক, তার যে নাম বা উপাধি হোক অথবা যে প্রতীকই হোক।

২১। রোযা হল কচি-কাঁচা শিশুর মনের মাটিতে 'আমানতদারী'র বীজ রোপণ করার এক বাস্তবভিত্তিক ইতিবাচক ও কার্যকর প্রক্রিয়া। শিশু-কিশোরকে রোযা রাখতে অভ্যাসী করার সময় যখন তাকে পানাহার করতে নিষেধ করা হয় এবং খাবার ও পানি হাতের কাছে থাকা সত্ত্বেও সে শুধু এই বিশ্বাসে তা খেতে পারে না যে, এ নিষেধ হল আল্লাহর এবং তিনি তাকে দেখছেন। অথচ এ ব্যাপারে কেবল তার মন ও বিবেক ছাড়া অন্য কেউ পর্যবেক্ষক নেই। সুতরাং কাঁচা মনে আমানতদারী বদ্ধমূল করতে এই অনুভূতি অপেক্ষা অধিক প্রতিক্রিয়াশীল আর অন্য কি হতে পারে?

যার ফলে শৈশব থেকেই শিশু আমানতদারীর মত এক নৈতিকতাপূর্ণ কর্মে অভ্যাসী হয়ে গড়ে ওঠে এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরেও তার যথার্থ হিফাযত করতে ও তার মনে তা আজীবন বহাল রাখতে কোন প্রকার কষ্টবোধ করে না।

২২। রোযা মানুষের হৃদয়কে নরম করে, আল্লাহ-প্রেমী করে এবং সর্বদা তাঁর যিকর ও শুকর করতে অভ্যাসী করে।

২৩। রোযা মানুষের মাঝে শয়তানের প্রবেশ ও প্রবাহ-পথ রুদ্ধ করে। এর ফলে তার দেহ-মনে শয়তানের আধিপত্য কমে যায়। পক্ষান্তরে যখনই মানুষ নিজ প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়, তখনই শয়তান তা লুফে নিয়ে তাকে যেদিকে ইচ্ছা সেদিকে পরিচালিত করতে থাকে।

২৪। রোযা হল আল্লাহর দেওয়া নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করার অন্যতম মাধ্যম। কারণ, রোযা হল পানাহার ও যৌনমিলন থেকে বিরত থাকার নাম। আর মানুষের উপর আল্লাহর যে সকল বড় বড় নেয়ামত রয়েছে তার মধ্যে পানাহার ও যৌনমিলন হল অন্যতম। সুতরাং মানুষ এ নেয়ামতের কদর তখনই বুঝবে, যখন সে এ নেয়ামত থেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বঞ্চিত থাকবে। কারণ, হারিয়ে না গেলে কোন নেয়ামতের কদর বুঝা যায় না। আর যখনই উক্ত নেয়ামতের কদর সে বুঝবে, তখনই তার অবশিষ্ট অধিকার আদায়ের জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করবে। পক্ষান্তরে নেয়ামতের শুক্র আদায় করা ফরয; শরীয়তে এবং বিবেক মতেও। রোযার আয়াতে মহান আল্লাহ ঐ কথার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলেন,

(ولعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْن)

অর্থাৎ, যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৫)

রোযাদার যখন ক্ষুধার জ্বালা অনুভব করে, তখন সে সেই গরীব-নিঃসবদের কষ্টের কথাও উপলব্ধি করে; যারা ক্ষুধার সময় পেটে এক মুঠো অন্নও যোগাড় করতে সমর্থ নয়। এর ফলে ঐ উপলব্ধি তাকে তাদের জন্য দান-খয়রাত করে সহানুভূতি প্রকাশ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কারণ, নিজের দেখা বিষয় শোনা বিষয়ের মত নয়। নিজের দেখা ও পরীক্ষা করা বিষয়ে অভিজ্ঞতালব্ধ প্রতীতি জন্মে অধিক। যেমন একজন ঘোড়সওয়ার লোক পথ চলার কষ্ট ততক্ষণ অনুভব করতে সক্ষম নয়; যতক্ষণ না সে নিজে পায়ে হেঁটে পথ চলে দেখেছে।

২৫। রোযার মাধ্যমে রোযাদার ক্ষুধা-জনিত দুর্বলতার ফলে সে আল্লাহর কতটা মুখাপেক্ষী তা আন্দাজ করতে পারে। আর যে ব্যক্তি নিজের মাঝে নিজের দুর্বলতা চিনতে পারে, সে ব্যক্তির মিথ্যা অহংকার দূরীভূত হয়ে যায়। পরন্তু আল্লাহ সেই ব্যক্তির প্রতি রহম করেন, যে নিজের কদর নিজে জেনেছে।

২৬। রোযাতে রোযাদার ফেরেশ্তামণ্ডলীর অনুরূপ কর্মে শামিল হতে পারে; যে ফেরেশ্তামণ্ডলী আল্লাহর কোন প্রকার অবাধ্যাচরণ করেন না। তাঁরা তাই করেন, যা করতে তাঁদের প্রতিপালক তাঁদেরকে আদেশ করেন। দিবারাত্র তাসবীহ পাঠ করতে থাকেন এবং কোন প্রকার ক্লান্তিবোধ করেন না। যাঁরা খান না এবং পানও করেন না।

২৭। রোযা রোযাদারের ঈমান বৃদ্ধি করে। এই রোযাতে মানুষ অধিকাধিক নামায পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত ও জিকির করে, দান-খয়রাত করে, দুআ ও ইস্তিগফার তথা তওবা করে, ওয়ায-নসীহত শোনে। রোযা তাকে মন্দ কাজ করতে বাধা দেয়। বলা বাহুল্য, এ সবে পাপ বন্ধ থাকে এবং ঈমান বর্ধিত হয়।

২৮। রোযার মাসে রোযাদারের দ্বীনী জ্ঞান বর্ধিত হয়ে থাকে। কারণ, রমাযান হল ইবাদতের মাস, আল্লাহর আয়াত নিয়ে ভাবনা-চিন্তা ও গবেষণা করার মাস। কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা ও শোনার মাস।

২৯। এ মাসে দ্বীনের আহবায়কদের জন্য রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। এ মাসে অধিকাংশ মুসলিম জনসাধারণ মসজিদের দিকে ধাবিত হয়। এদের মধ্যে কেউ বা তার জীবনে প্রথমবার প্রবেশ করে, কেউ বা অনেক দিন হল মসজিদ ত্যাগ করেছিল। এ সময় তাদের হৃদয় এক প্রকার দুর্লভ নম্রতা ও তরঙ্গায়িত ভক্তিতে গদ্গদ্ করে।

সুতরাং এ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে মন-গলানো উপদেশমালা এবং উপযুক্ত ওয়াজ ও দারস প্রয়োগ করে তাদের ঈমান বাড়াতে সাহায্য করা উচিৎ। আর এ কাজে অবশ্যই সৎ ও আল্লাহভীতির কাজে সহায়তা হয়ে থাকে।

পরন্তু রমাযানের রোযা বছরান্তে একবার ফরযরূপে এসে থাকে। যা হজ্জের মত জীবনে একবার নয়। যাতে প্রত্যেক বছর ঈমানী দর্সের পুনরাবৃত্তি হয় এবং রোপিত ঈমানী বৃক্ষ সহসায় বেড়ে ওঠে।

৩০। রোযার মাধ্যমে মুসলিমদের সামাজিক উপকারিতা সাধন হয়ে থাকে। রোযা হল মুসলিম জাতির ঐক্যের নিদর্শন, সারা উম্মাহর মাঝে সংহতির প্রতীক, গরীব-ধনীর মাঝে সাম্য ও সম্প্রীতির চিহ্ন। এতে আম-খাস, আতরাফ-আশরাফ, আমীর-ফকীরের ভেদাভেদ চূর্ণ হয়ে যায়। সকলের মনে একটাই বোধ জাগে যে, মুসলিম জাতি হল এক জাতি। সকলে একই সময়ে পানাহার করে, একই সময়ে রোযা রাখে। একই জামাআতে মসজিদে তারাবীহর নামায পড়ে। যেন সকলের হৃদয় এক, মাস এক, কর্মও এক, যাদেরকে তাদের নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, তারা হল একটি দেহের মত।

৩১। রোযার উপবাস সবাস্থ্যের জন্য বড় উপকারী। রোযাতে তুলনামূলকভাবে কম খাওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট সময় ধরে পাকস্থলীকে বিরতি দেওয়া হয়। এর ফলে শরীরের মেদ, ক্লেদ ও আর্দ্রতা ইত্যাদি দূরীভূত হয়ে যায়। আর একথা বিদিত ও স্বীকৃত যে, শরীরের মধ্যে পেট হল রোগের বাসা এবং ব্যবস্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত খাদ্য আহার করা হল শ্রেষ্ঠ চিকিৎসা। বলা বাহুল্য, এ কথা বহু চিকিৎসকই স্বীকার করেছেন যে, রোযাতে রয়েছে বহু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি থেকে নিরাপত্তা, বিশেষ করে যক্ষ্মা, ক্যানসার ইত্যাদি।

রোযায় রয়েছে শরীরের ওজন বৃদ্ধি, হ্যাপাটাইটিস, জন্ডিস, প্লীহা, যকৃৎ, বদহজম, প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

রোযা ফরয হয়েছে সুস্থ মানুষের উপর। যাতে আক্রমণের পূর্বেই ঐ সকল বা আরো অজানা বহু রোগের হাত থেকে বাঁচার উপায় পাওয়া যায়। তাছাড়া বহু গবেষণা এ কথা প্রমাণ করেছে যে, পানাহার থেকে বিরত থাকা একটি প্রকৃতিগত ব্যাপার; যা মহান সৃষ্টিকর্তা নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময় ব্যাপী জীবজগতের জন্য অনিবার্য করেছেন।

আর তা শুধু এই জন্য যে, যাতে করে প্রাণীজগৎ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়, বাঁচার জন্য শক্তি পায় এবং নিজ নিজ বংশবিস্তারে যথানিয়মে সক্রিয় থাকতে পারে।

জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের উপবাস করার কথা অনেকের অজানা নয়। কোন কোন জন্তু লম্বা সময় ধরে প্রায় কয়েক মাস যাবৎ উপবাস করে। কোন কোন জন্তু কয়েক দিন ধরে উপবাস করে। বরং উদ্ভিদজগৎও উপবাস পালন করে থাকে। যার ফলে নতুন, সুন্দর ও লকলকে পাতা বের হয়ে আসে এবং শান্ত শীতে নিদ্রার পর ফুল-ফলে সুশোভিত হয়ে শক্তিশালী ও সজীবরূপে শুরু হয় বৃক্ষ-তরুলতার আনন্দময় বসন্তকাল।

ডাঃ সলোমন মানব-দেহকে ইঞ্জিনের সাথে তুলনা করে বলেন, 'ইঞ্জিন রক্ষাকল্পে মধ্যে মধ্যে ডকে নিয়া চুল্লি হইতে ছাই ও অঙ্গার সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাশিত করা যেমনটা আবশ্যক - উপবাস দ্বারা মধ্যে মধ্যে পাকস্থলী হইতে অজীর্ণ খাদ্যটি নিষ্কাশিত করাও তেমনটা দরকার।

৩২। রোযা মানুষের চিন্তাশক্তির প্রখরতা বৃদ্ধি করে। কারণ, পেট খালি থাকলে চিন্তা-গবেষণা নির্মল হয় এবং মন-মগজের কর্ম সুন্দর হয়।

পক্ষান্তরে যারা ধারণা করে যে, রোযা মানুষের খরচ বাড়ায় এবং অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় এই রোযার মাসে, তাদের ধারণা সঠিক নয়। কেননা, খাবারের নানান ভ্যারাইটিজ তৈরী করা এবং প্রয়োজনের তুলনায় বেশী খাবার প্রস্তুত করা, রমাযানের জন্য বিশেষ বিশেষ ধরন ও বরনের খাদ্যপণ্যের বিপণন ঘটানোতে ইসলামের অনুমোদন নেই। বরং তা হল অপচয়। আর অপচয় ইসলামে নিষিদ্ধ; রমাযানে এবং অন্য মাসেও।

বলাই বাহুল্য যে, রোযাতে রয়েছে মঙ্গলই মঙ্গল। ব্যক্তি ও সমাজের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে সেই মঙ্গল অনস্বীকার্য। আর মহান আল্লাহর এই বাণীর মধ্যে সেই মঙ্গলের প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। তিনি বলেন,

(وَأَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ)

অর্থাৎ, তোমাদের রোযা রাখাটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর; যদি তোমরা উপলব্ধি কর। (কুরআনুল কারীম ২/১৮৪)

লাইলাতুল কদরের গুরুত্ব ও তাৎপর্য

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতকে সকল রাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি তার কালামে এ রাতকে প্রশংসার সাথে উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর কালাম সম্পর্কে বলতে যেয়ে এরশাদ করেন :

'আমি তো ইহা অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রজনীতে। আমি তো সতর্ককারী। এ রজনীতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়।

বরকতময় রজনী হল লাইলাতুল কদর। আল্লাহ তাআলা একে বরকতময় বলে অভিহিত করেছেন। কারণ এ রাতে রয়েছে যেমন বরকত তেমনি কল্যাণ ও তাৎপর্য। বরকতের প্রধান কারণ হল এ রাতে আল-কুরআন নাযিল হয়েছে। এ রাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-সিদ্ধান্ত লওহে মাহফুজ থেকে ফেরেশতাদের হাতে অর্পণ করা হয় বাস্তবায়নের জন্য। এ রাতের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ তাআলা এ রাত সম্পর্কে একটি পূর্ণ সূরা অবতীর্ণ করেছেন। যা কিয়ামত পর্যন্ত পঠিত হতে থাকবে।

'নিশ্চয় আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক মহিমান্বিত রজনীতে। আর মহিমান্বিত রজনী সম্পর্কে তুমি কী জান? মহিমান্বিত রজনী সহস্র মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। সে রাতেই ফেরেশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি, সে রজনী উষার আবির্ভাব পর্যন্ত।

এ সূরাতে যে সকল বিষয় জানা গেল তা হল:

১. এ রাত এমন এক রজনী যাতে মানবজাতির হিদায়াতের আলোকবর্তিকা মহা গ্রন্থ আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

২. এ রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ তিরাশি বছরের চেয়েও এর মূল্য বেশি।

৩. এ রাতে ফেরেশতাগণ রহমত, বরকত ও কল্যাণ নিয়ে পৃথিবীতে অবতরণ করে থাকে।

৪. এ রজনী শান্তির রজনী। আল্লাহর বান্দারা এ রাতে জাহান্নামের শাস্তি থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি অর্জন করে থাকে।

৫. সময়ের প্রতি গুরুত্ব দেয়া।

এ আয়াতগুলোতে অল্প সময়ে বেশি কাজ করার জন্য উৎসাহ প্রদান করা হল। যত সময় তত বেশি কাজ করতে হবে। সময় নষ্ট করা চলবে না।

৬. গুনাহ ও পাপ থেকে ক্ষমা লাভ।

এ রাতের এই ফযীলত সম্পর্কে বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত হাদীসে এসেছে,

إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البخاري:১২৬৬ ومسلم:৩৪

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : 'যে লাইলাতুল কদরে ঈমান ও ইহতিসাবের সাথে সালাত আদায় ও ইবাদত-বন্দেগী করবে তার অতীতের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।'

লাইলাতুল কদর কখন ?

আল-কোরআনে নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি লাইলাতুল কদর কোন রাত। তবে কুরআনের ভাষ্য হল লাইলাতুল কদর রমজান মাসে। কিয়ামত পর্যন্ত রমজান মাসে লাইলাতুল কদর অব্যাহত থাকবে। এবং এ রজনী রমজানের শেষ দশকে হবে বলে সহীহ হাদীসে এসেছে। এবং তা রমজানের শেষ দশকের বেজোড় রাতগুলোতে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে হাদীসে এসেছে।

تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان .البخاري(১৮৭৪:

'তোমরা রমজানের শেষ দশকে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ কর।

এবং রমজানের শেষ সাত দিনে লাইলাতুল কদর থাকার সম্ভাবনা অধিকতর। যেমন হাদীসে এসেছে,

… فمن كان متحريا بها فليتحرها في السبع الأواخر. البخاري:(১৮৭৪, مسلم:১৯৮)

‘যে লাইলাতুল কদর অন্বেষণ করতে চায় সে যেন শেষ সাত দিনে অন্বেষণ করে।

অধিকতর সম্ভাবনার দিক দিয়ে প্রথম হল রমজান মাসের সাতাশ তারিখ। দ্বিতীয় হল পঁচিশ তারিখ। তৃতীয় হল উনত্রিশ তারিখ। চতুর্থ হল একুশ তারিখ। পঞ্চম হল তেইশ তারিখ। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এ রাতকে গোপন রেখেছেন আমাদের উপর রহম করে। তিনি দেখতে চান এর বরকত ও ফযীলত লাভের জন্য কে কত প্রচেষ্টা চালাতে পারে।

লাইলাতুল কদরে আমাদের করণীয়-

লাইলাতুল কদরে আমাদের করণীয় হল বেশি করে দোয়া করা।

আয়েশা(রা.) নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -কে জিজ্ঞেস করলেন, লাইলাতুল কদরে আমি কি দোয়া করতে পারি? তিনি বললেন, বলবে-

اَللّٰهُم إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ العَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ .

‘হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল। ক্ষমাকে ভালোবাসেন, অতএব আমাকে ক্ষমা করুন।

রোজা সম্পর্কে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত

বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা:

রোজা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত মঙ্গলকর। কারণ রোজা পালনে পেটের অভ্যন্তরীণ গোলযোগ থাকতেই পারে না বলে আমি মনে করি। মুসলমানদের পূর্ণ উপবাস ব্রত বিজ্ঞানের বহু শাখা প্রশাখার গন্ধ পাওয়া যায়। এগারো মাস পর একাধারে নিয়ম অত্যন্ত সুন্দর।

ডাক্তার হেনরি এডওয়ার্ড:

রোজা মাসের রোজা মানে অসামাজিক কার্যকলাপ, প্রতিবেশ ব্যক্তিগত সমস্যা ও রোগ শোক এবং মিথ্যা বলা থেকে রক্ষা পাওয়ার মোক্ষম অবলম্বন। আমি এ মহাসত্যকে স্বীকার করছি। রোজার মধ্যে মানবের সুন্দর চরিত্র সৃষ্টির অবদান লুকিয়ে আছে।

মহাত্মা গান্ধী:

মুসলমানদের রোজা উপবাসব্রতের অতি উত্তম নিয়ম। মনের তাগিদে আমিও এর ব্যবস্থা অবলম্বন করি। যদিও আমি একজন খাঁটি ব্রাহ্মণ। আমিও ঠিক রোজার মতো নিজের উপর সঠিক পরীক্ষা করে যাই। রোজায় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক সুফল পাওয়া যায়। শুধু তাই নায়, পরমাতার সঙ্গে যোগাযোগটা যথেষ্ট নিকটতর হয়। অধিকাংশ সময় আমার উপবাসব্রতের অভ্যাস রয়েছে বলেই আমি মুসলমানদের রোজা সম্পর্কে আমার অভিমত ব্যক্ত করলাম।

ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়:

রোজাকে সুন্দর একটি পবিত্র ঔষধ বললে ভুল, অন্যায় কিংবা অতুক্তি হবে না বলেই আমার ব্যক্তিগত ধারণা।

পন্ডিত বিদ্যাসাগর কাশ্মীরি:

রোজা বা ইসলামের নির্দেশে ব্রত হচ্ছে পৃথিবীর অপরাপর সমস্ত ব্রত থেকে শ্রেষ্ঠ। আমি আমার স্বজাতি ভাই-বোনকে আন্তরিক অনুরোধ জানিয়েছি, জানাচ্ছি এবং জানাবো উপবাস যদি করতে হয়, তাহলে তারা যেন ঠিক ইসলামের নিয়ম-পদ্ধতি পালন করে।

ডাক্তার জিসিআর গুপ্ত:

পবিত্র রোজা পালনের যে আদেশ ইসলামে আছে, তা মানবের আত্মিক ও দৈহিক মঙ্গলের জন্যই। রোজা সত্যিই উপকারের আকারে কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ডাক্তার স্যামুয়েল আলেকজান্ডার:

রোজা হচ্ছে রকমারি মানসিক রোগ গুলোর উত্তম ঔষধ, চমৎকার এবং ফলপ্রসূ প্রতিষেধক, আত্মাকে নির্মল করে দেয়, ঠিক তেমনি পবিত্র রাখে।

অধ্যাপক সোর্ড:

রোজা মানুষকে দুষ্কর্ম থেকে শুধু দূরে সরিয়ে রাখে না, বরং সাংঘাতিক ও মারাত্মক ধরনের রোগের কবর থেকে রক্ষা করে।

রোগ প্রতিরোধে রোজার ভূমিকা

ইসলামের অন্যতম ফরজ রুকন রোজা কেবল মানবতার পরিশুদ্ধি সাধনই করে না বরং তা শরীরকে রোগ প্রতিরোধে সহায়তা করে. চিকিৎসা বিজ্ঞানের গবেষণায় এ ধরনের অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। যখন আমরা খাওয়া বন্ধ রাখি এবং পাকস্থলীকে বিরতি দেই তখন দেহে সংরক্ষিত জীবনী শক্তির এক নবজীবনের উদ্ভব হয়। ডাক্তার জুয়েলস এম.ডি. বলেন যখন একবেলা খাওয়া বন্ধ থাকে তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগ মুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে। তিনি আরো বলেন,খাদ্যর পরিপাক ও আত্তীকরণে যে শক্তি ব্যয় হয় ,খাওয়া বন্ধ করে আমরা যদি সেই শক্তি অন্যদিকে নিয়োজিত করি ,তবে দেহের অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত অংশ বিদূরিত করতে তা কাজ করার শক্তি পায়। পাক-প্রণালী যখন তার আত্তীকরণে বিরতি দেয় ,তখন পাকস্থলী ও অন্ত্রের স্লিশমিক ঝিল্লি দেহযন্ত্র থেকে জীর্ণ পদার্থ গুলোকে দূরে পরিপাকের বেলায় অনেকটা স্পঞ্জের মত কাজ করে। অতিভোজনের ফলে দেহের স্নায়ু কোষে বিষক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে শরীরে নেমে আসে অস্বাভাবিক ক্লান্তিবোধ ও জড়তা। সিয়াম সেখানে প্রতিষেধকের কাজ করে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে ,পানাহার বন্ধ রাখলে অনেক জীবাণু মারা পরে.মেডিকেলের ভাষায় বলা যায় ,জীর্ণ ও ক্লিষ্ট মানুষটি উপোস থাকছে না ,সত্যিকার ভাবে উপোস থাকছে রোগটি। প্রাচীন চিকিৎসা বিজ্ঞানী

হিপোক্রেটিস বলেছেন ,অসুস্থ দেহে যতই খাবার দিবে রোগ ততই বাড়তে থাকবে। গ্রাহাম রাখলো জেনিগস্স প্রমুখ গবেষক এ বিষয়টি সত্য বলে প্রতিপন্ন করেছেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের মতে সর্দিজনিত বধিরতা,অস্থিকোষ ও দাঁতের রোগ সিয়ামে নিরাময় হয় এবং খাদ্যে অরুচি অনীহা দূর করে।

রমজানে অন্য মাসের তুলনায় কম খাওয়া হয়। এই কম খাওয়ার স্বাস্থ্যের অনুকূল। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতেও বেশি খাদ্য নয়,কম খাদ্যই দীর্ঘায়ুর চাবিকাঠি। আরও লক্ষণীয়,আমাদের পরিপাক প্রণালী কে ঠিকমতো চালানোর জন্য সপ্তাহ অন্তর যদি একদিন এক বেলা পানাহার বন্ধ রাখা যায়,তাহলে কোন অসুবিধা নেই বরং উপকারিতা রয়েছে নানামুখী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,"পাকস্থলীকে তিন ভাগে ভাগ করে একভাগ খাদ্য,এক ভাগ পানি ও বাকি একভাগ খালি রাখা ভালো"

মোট কথা,মানব শরীর একটি যন্ত্র সাদৃশ। নির্মাতা যেমন তার যন্ত্র সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকেন,মানব নামের শরীরটা পরিচালনা করার জন্য কি কি মালমশলা দরকার মানবস্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনেরই একমাত্র তা জানা আছে। রোজার ক্ষেত্রে মহাজ্ঞানী আল্লাহতালার আইন প্রণয়নের সে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তাই আল্লাহ যেহেতু বছরের বারো মাসের মধ্যে একমাস রোজা ফরজ করেছেন,সেহেতু এ নির্দেশকে যথার্থ মনে করা আর তার হুকুম তামিল করা আমাদের একান্ত। করণীয় এতে কারো সন্দেহ থাকা উচিত নয়।

একমাস রোজা রাখার ফলে শরীরের অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিশ্রাম ঘটে প্রতিদিন প্রায় ১৫ ঘণ্টা সময় এই বিশ্রামের লিভার কিডনি মুক্তথলিসহ দেহের অভ্যন্তরীণ অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দীর্ঘ একমাস কালব্যাপী বিশ্রাম পায় এতে মানবদেহে যন্ত্রপাতির আয়ুষ্কাল ও বেড়ে যায়। সারা বছর দেহের অভ্যন্তরে যে বিষ সৃষ্টি হয় তা এক মাসের সিয়াম সাধনায় পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়।

প্রখ্যাত ডাক্তার জোশ বলেন -যখনই কেউ একবেলা খাওয়া বন্ধ রাখে তখনই দেহ সেই মুহূর্তটিকে রোগমুক্তির সাধনায় নিয়োজিত করে. ডাক্তার এম. রাহাত বলেন-

অতিভোজনের ফলে অনেকেরই পাকস্থলী বড় হয়ে যায় ,রোজার ফলে এই বড় পাকস্থলী স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে, রোজা রাখলে গ্যাস্ট্রিক আলসার হবে বা বেড়ে যাবে কথাটি সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও যুক্তিহীন।ফুসফুসে কোন রকম প্রতিবন্ধকতা বা বাধার সৃষ্টি হলে রমজানের রোজা তা দূর করে দেয়।

ডাক্তার দেওয়ান এ.কে. এম আব্দুর রহিম বলেন,- রোজা পালনে মস্তিষ্ক এবং স্নায়ুতন্ত্র সর্বাধিক উজ্জীবিত হয়। আল্লাহর কুরআন রাসূলের সুন্নাহ এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা সব দিক থেকেই মাহে রমজান মুসলিম জাতির জন্য বিরাট রহমত। স্বাস্থ্যের জন্য অনন্য নিয়ামত। আত্মিক পরিশুদ্ধির জন্য অন্যতম মাধ্যম এতে কোন সন্দেহ নেই. নিজেকে সত্যিকারের মানুষে পরিণত করার জন্য নিষ্কলুষ চরিত্রের পরাকাষ্ঠা দেখানো নিমিত্তে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ার জন্য রোজা আমাদের জীবনের জন্য একটি উপকারী ইবাদত। একজন বিবেকবান সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী হিসেবে আমরা নিজের স্বার্থেই রোজা রাখব। আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দিন.

রোজার কতিপয় মাসাইল

রোজা ফরজ হওয়ার শর্ত ৪ টি।

১. মুসলমান হওয়া।কাফিরের উপর রোজা ফরজ নয়।

২. বালিগ হওয়া।

৩. রমজানের রোজা ফরজ হওয়া সম্পর্কে জানা থাকা।

৪. মাজুর বা অক্ষম না হওয়া। অর্থাৎ এমন কোন ওযর না থাকা যাতে রোজা না রাখার অনুমতি রয়েছে। যেমনঃ- সফর ,বার্ধক্য ,রোগ,জিহাদ ইত্যাদি।

রোজার নিয়ত

১. রোজার নিয়ত করা ফরজ। নিয়ত ছাড়া রোজা পালন করা অর্থহীন। যেমন ,কোন ব্যক্তি সারাদিন পানাহার বা স্ত্রী সহবাস না করে রোজাদারের মত থাকলো অথচ সে রোজার নিয়ত করেনি। তবে তার রোজা হবে না.

২. মনে মনে রোজা রাখার ইচ্ছা করাই হচ্ছে নিয়ত।এর জন্য শাব্দিক উচ্চারণ আদৌ জরুরি নয়. নিয়ত সম্পর্কে কোন নির্দিষ্ট বাক্য রাসূল সাঃ হতে প্রমাণিত নেই।

৩. রমজানের সেহরি খাওয়ার সময়ই নিয়ত করতে হবে। তবে নফল রোজার জন্য সুবহে সাদিক থেকে দুপুরের পূর্ব পর্যন্ত যে কোন সময় নিয়ত করলে তা শুদ্ধ হবে।

৪. যদি কোনো রোজাদার ব্যক্তি মনে মনে ধারণা করে যে সে রোজা ভেঙে ফেলবে,কিন্তু কার্যত সে পানাহার বা রোজা ভঙ্গের কোন কাজই করেনি এতে তার পূর্ব নিয়ত নষ্ট হবে না,বরং রোজা হয় আদায় হয়ে যাবে।

৫. কেউ যদি রমজানের রোজার কাযা ও মান্নতের রোজার নিয়ত একত্রে করে তবে রমজানের কাযাই আদায় হবে। মান্নতের রোজা আদায় হবে না.

৬. রমজানের কাযা ও নফল রোজা একত্রে নিয়ত করলে রমজানের কাযা আদায় হবে নফল রোজা আদায় হবে না।

রোজার ফরজ

রোজার ফরজ ৩টি। যথা :

১. রোজার নিয়ত করা।

২. কোন কিছু পানাহার করা থেকে বিরত থাকা।

৩. সকল ধরণের যৌন বাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা।

রোজার সুন্নাত

১. সেহরি খাওয়া।

২. সেহরি সুবহে সাদিকের সামান্য পূর্বে খাওয়া।

৩. সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ইফতার করা।

৪. রমজান মাসের শেষ দশ দিন ইতিকাফ করা।

৫. সর্বদা নেক কাজে রত থাকা।

৬. গীবত, চোগলখুরি, মিথ্যা বলা, রাগারাগি করা এবং বাড়াবাড়ি না করা।

রোজা ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় তার দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. যে সব কারণে রোজার কাযা করা ওয়াজিব হয়।

২. যে সব কারণে রোজার কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়।

রোজা ভঙ্গের কারণ

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় তার দুটো শ্রেণীতে বিভক্ত:

১. যে সব কারণে রোজার কাযা করা ওয়াজিব হয়।

২. যে সব কারণে রোজার কাযা ও কাফফারা ওয়াজিব হয়।

যেসব কারণে রোজার কাজা করা ওয়াজিব হয়

১. সেহরির সময় আছে মনে করে সুবহে সাদিকের পর পানাহার করলে বা স্ত্রী সহবাস করলে।

২. স্ত্রী কে চুম্বন স্পর্শ করার কারণে বীর্যপাত হলে।

৩. জোরপূর্বক রোজাদারকে কিছু খাওয়ালে।

৪. ভুলক্রমে কোন কিছু খেতে আরম্ভ করলে রোজা নষ্ট হয়েছে মনে করে পুনরায় আহার করলে।

৫. কুলি করার সময় অসাবধনতায় গলার মধ্যে পানি চলে গেলে অথবা ডুব দেয়ার সময় হঠাৎ নাক, মুখ দিয়ে গলার মধ্যে পানি চলে গেলে।

৬. প্রশাব ,পায়খানার রাস্তায় ঔষধ বা অন্য কোন কিছু প্রবেশ করালে।

৭. ঘুমন্ত অবস্থায় কিছু খেয়ে ফেললে।

৮. সূর্য অস্ত গেছে মনে করে সূর্যাস্তের পূর্বে ইফতার করলে।

৯. ইচ্ছা করে মুখ ভর্তি বমি করলে।

১০. দাঁত হতে ছোলা পরিমান কোন কিছু বের করে খেয়ে ফেললে।

১১. মুখ বমি আসার পর পুনরায় তা গিলে ফেললে।

১২. বৃষ্টির পানি মুখে পড়লে তা গিলে ফেললে।

১৩. রোজার সেহরি খাবার পর কেউ যদি মুখে পান রেখে ঘুমিয়ে পরে এবং তা মুখে থাকা অবস্থায় ভোর হয়ে যায় ,তাহলে সে রোজা শুদ্ধ হবে না;কিন্তু রোজা ভাঙতেও পারে না.পরে এর কাযা আদায় করতে হবে।

কাযা কাফফারার সংক্ষিপ্ত বিবরণ

'কাযা' অর্থ ক্ষতিপূরণ করা. রোজা কাযা করার অর্থ হচ্ছে শরীয়ত সম্মত কোন কারনে যে পরিমান রোজা রাখতে অক্ষম হয় ,সে পরিমান রোজা রমজানের পরে আদায় করা।

'কাফফারা' শব্দের অর্থ গোপন করা, প্রতিবিধান করা, ঢেকে রাখা, আবৃত করা। শরীয়তের পরিভাষায় কোন গুনাহের কাজকে ঢেকে রাখতে বা প্রতিরোধ করতে যে কাজ কর হয় বা যা কিছু দান করা হয়, তাকে কাফফারা বলে।

১.রমজানের দিনে স্ত্রী-সহবাস জনিত রোজার কাফ্ফারা হলো ৬০টি রোজা। লাগাতারভাবে এই রোযা রাখতে হয়। এমনকি কেউ যদি ৫৯টি রোজা রাখার পর তা ছেড়ে দেয় তাহলেও তাকে পুনরায় শুরু থেকে ৬০টি রোজা রাখতে হবে।

২.যদি কারো রোজা রাখার শক্তি না থাকে,তাহলে রমজান মাসের কাযার রোজার জন্য ৬০জন মিসকীনকে ২বেলা তৃপ্তি সহকারে খাওয়াতে হবে।

৩.রমজান মাসের একের অধিক রোজা ভেঙে থাকলে একটি কাফ্ফারাই ওয়াজিব হবে। কিন্তু যে কয়টি রোজা ভেঙেসে সে কয়টি রোজা কাযা করতে হবে।

যেসব কারণে রোজা ভঙ্গ হয় না

১. কোন রোজাদার ব্যক্তি যদি ভুলে পান করে কোন কিছু এবং রোজার কথা মনে না থাকে একেবারেই , তাহলে ওই ব্যক্তির রোজা ভঙ্গ হবে না।

২. অনিচ্ছায় বমি হলে।

৩. অধিক পরিমাণে মুখের থুথু গিলে ফেললে।

৪. নাকে অথবা কানে পানি গেলে।

৫. ঢেঁকুর উঠলে।

৬. তৈল মালিশ করলে।

৭. চোখে সুরমা ব্যবহার করলে।

৮. হঠাৎ করে মশা, মাছি বা ধুলাবালি গলার মধ্যে চলে গেলে।

৯. রাতের ফরয গোসল দিনে করলে।

১০. মিথ্যা কথা বললে, গীবত করলে, ফাহেশা কথা বললে।

যে কারণে রোজা মাকরূহ হয়

১. গীবত করা,মিথ্যা বলা,মারপিট করা,গালিগালাজ করা অথবা অপরের প্রতি জোর-জুলুম করা।

২. কোন কিছুর স্বাদ আস্বাদন করা। বদমেজাজী স্বামী বা মনিবের ভয় থাকলে তরকারি বা খাদ্যদ্রব্য জিহবা দিয়ে স্বাদ নেয়া মাকরূহ নয়।

৩. মুখে খাদ্যদ্রব্য চিবানো,অবশ্য বাচ্চাদের খাওয়ানোর বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজনে মুখে খাদ্যদ্রব্য চিবিয়ে বাচ্চাদের খাওয়াতে পারবে।

৪. ওযুর সময় বার বার কুলি করা। প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি ব্যবহার করা।

৫. ইচ্ছা করে সামান্য পরিমান বমি করা।

৬. ভেজা কাপড়-চোপড় শরীরে জড়িয়ে রাখা।

৭. ইফতারের সময় বিলম্ব করা।

৮. রোজা রেখে এমন কোন কাজ করা যাতে রোজাদারের দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে ফেলার আশংকা হয়।

৯. বিনা কারণে থুথু জমা করে গিলে ফেলা।

যে সকল অবস্থায় রোজা ভঙ্গ করা জায়েয

১. মুসাফির ব্যক্তির কোন রোজা না রাখা জায়েজ আছে। পরে কাযা আদায় করে নিবে।

২. অসুস্থ ব্যক্তি, যার রোজা রাখলে রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা আছে। সে রোজা থাকলেও এমতাবস্থায় রোজা ভাঙ্গা জায়েজ আছে।

৩. গর্ভধারিনী মা রোজা রাখলে সন্তানের ক্ষতির আশংকা থাকলে অথবা নিজের জীবন নাশের আশঙ্কা থাকলে রোজা না রাখা জায়েজ আছে।

৪. বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তি বয়স বেশি হওয়ার কারণে রোজা থাকলে দুর্বল হলে বা নিজের জীবন নাশের আশঙ্কা থাকলে রোজা না রাখা জায়েজ আছে।

৫. স্তন্যদানকারিণী মহিলার দুধ কমে যাওয়ার আশংকা থাকলে এবং শিশুর কষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে।

৬. সাপে কাটা ব্যক্তি,যাকে সাপে দংশন করেছে সে রোজা সেরে দিতে পারবে।

৭. কেউ সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লে বা কোন দুর্ঘটনায় পতিত হলে, জীবন নাশের আশংকা থাকলে সে ক্ষেত্রে রোজা ভঙ্গ করা জায়েজ।

রোজার কতিপয় আদব

১. যে ব্যক্তি শরীয়ত সম্মত কারণে রোজা পালনে অক্ষম সে যেন সারাদিন প্রকাশ্যে পানাহার না করে বাহ্যিকভাবে রোজাদারের মতো সময় অতিবাহিত করে।

২. কোন মুসাফির ব্যক্তি বাড়ি ফিরে এসে মুকিম হওয়ার নিয়ত করলে তার দিনের বাকি অংশ রোজা পালনকারীর মতো অতিবাহিত করা মুস্তাহাব।

৩. যার মধ্যে রোজা পালনের সকল শর্ত পাওয়া যাবে তার রোজা কোন কারনে নষ্ট হয়ে গেলে ঐ দিনের বাকি সময় তার রোজাদার ব্যক্তির মত অতিবাহিত করা ওয়াজিব।

৪. কোন ব্যক্তি রাট আছে মনে করে যদি সুবহে সাদিকের পরে খানা খায় অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে দিনের বেলা রোজা নষ্ট করে ফেলে ,তবুও তার রোজাদারের মত দিনের বাকি অংশ অতিবাহিত করা ওয়াজিব।

৫. রোজা রাখার নিয়ত করার পর যদি কোন মহিলার হায়েজ শুরু হয়ে যায়,তখন যদি সে রোজা ছেড়ে দিবে বলে রোজা নষ্ট করে ফেলে,তবু সে রোজাদারের মত দিনের বাকি অংশ অতিবাহিত করবে।

চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু জরুরি মাসাইল

সময়ের প্রয়োজনে যুগের চাহিদায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে নতুন নতুন চিকিৎসা ব্যবস্থা যুক্ত হয়েছে। যার ফলে রোজার শুদ্ধতা রক্ষায় সম্মানিত মুফতি ও ফিক্হবিদগণ গবেষণা করে দেখেছেন যে মূলনীতি ঠিক রেখে কিসে রোজা ভাঙবে আর কিসে ভাঙবে না।

নিম্নে রোজা সংক্রান্ত কিছু আধুনিক মাসাইল নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১. মস্তিষ্ক অপারেশন: রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ গলায় পৌঁছায় না তাই

২. কানে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার: কানে ড্রপ,ঔষধ, তেল ও পানি দিলে রোজা ভঙ্গ হবে না।

৩. চোখে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার: ড্রপ,সুরমা ও মলম ইত্যাদি কিছু দিলে রোজা ভাঙবে না। যদিও এগুলোর স্বাদ গলায় উপলব্ধি হয়। চোখে কিছু দিলে রোজা না ভাঙার কথা হাদিস দ্বারা প্রমাণিত।

৪. অক্সিজেন ব্যবহার: নাকে অক্সিজেন নিলে রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ অক্সিজেন দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু নয়। রোজা ভঙ্গ হতে হলে দেহবিশিষ্ট কোন বস্তু দেহের অভ্যান্তরের গ্রহণযোগ্য জায়াগায় পৌঁছাতে হয়।

৫. এন্ডোস্কোপি: এন্ডোস্কোপি করলে রোজা ভাঙবে না। তবে নল বা বাল্বের সাথে কোন ঔষধ লাগানো থাকলে রোজা ভেঙে যাবে।

৬. এনজিওগ্রাম: এনজিওগ্রাম করলে রোজা ভঙ্গ হবে না।

৭. রক্ত দিলে ও নিলে: রোজা ভাঙবে না।

৮. ইনজেকশন: ইনজেকশন গোশতে বা রগে যেখানেই নেয়া হোক না কেন রোজা ভাঙবে না।

৯. স্যালাইন: রোজা ভাঙবে না, তবে রোজার দুর্বলতা দূর করার জন্য স্যালাইন নেয়া মাকরূহ।

১০. ইনসুলিন: রোজা ভাঙবে না।

১১. পেশাবের রাস্তায় ঔষধ ব্যবহার: রোজা ভাঙবে না।

১২. যোনিদ্বারে ঔষধ ব্যবহার: রোজা ভাঙবে না।

১৩. সিস্টোস্কোপি: রোজা ভাঙবে না।

১৪. কপার-টি: রোজা ভাঙবে না। তবে কপার-টি লাগিয়ে সহবাস করলে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে এবং কাজ ও কাফফারা উভয়টিই ওয়াজিব হবে।

১৫. ল্যাপারোস্কপি-বায়োপসি: রোজা ভাঙবে না। তবে সাবধানতার সাথে ব্যবহার করা উচিত ,যদি ঔষধ লাগানো থাকে তাহলে রোজা ভেঙে যাবে।

১৬. সিরোদকার অপারেশনে রোজা ভাঙবে না।

১৭. ঔষধ সেবন করে হায়েজ বন্ধ রেখে রোজা রাখা। এতে স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। গুনাহ হবে না। তবে নামাজ, রোজা সবই আদায় করতে হবে।

যেসব চিকিৎসায় রোজা ভাঙবে:

১. নাকে ঔষধ বা ড্রপ ব্যবহার: নাকে ড্রপ, পানি ইত্যাদি দিয়ে ভিতরে টেনে নিলে রোজা ভাঙবে। কারণ নাক রোজা ভঙ্গ হবার গ্রহণযোগ্য রাস্তা। কারণ, নাকে কিছু দিলে তা গলা পর্যন্ত পৌঁছায়।

২. মুখে ঔষধ ব্যবহার: যতই অল্প হোক ঔষধ মুখে নিয়ে গিলে ফেললে রোজা ভাঙবে।

৩. সালেবুটামোল ইনহেলার ব্যবহার: শাসকষ্ট দূর করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। ঔষধটি দেহবিশিষ্ট। কারণ,কাঠ বা কোনো কিছুর উপর স্প্রে করলে দেখা যাবে যে ঐ বস্তুটি ভিজে গেছে। তাই রোজা ভাঙবে।

৪. নাইট্রোগ্লিসারিন ব্যবহার: হার্টের রোগীরা এটি ব্যবহার করে থাকেন। এটি জিহবার নিচে দেয়া হয় এবং শিরার মাধ্যমে রক্তের মধ্যে মিশে যায় ফলে তা গলার মধ্যে পৌঁছে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এতে রোজা ভঙ্গ হয়ে যাবে। তাই সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। তবে ঔষধটি ব্যবহারের পর না গিলে থুথু দিয়ে ফেলে দেয়া হয় তাহলে আর রোজা ভঙ্গ হবে না। কারণ,শুধু শিরার মাধ্যমে ঢুকলে রোজা ভঙ্গ হয় না।

৫. সাপোজিটরী-ভোল্টালিন: রোজা ভেঙ্গে যাবে।

৬. ডুশ: রোজা ভেঙ্গে যাবে।

৭. প্রোক্টোস্কোপি: রোজা ভেঙে যাবে।

৮. গর্ভপাত: এর ভিতরে আছে এম.আর ও ডি এন্ড সি। এর ফলে রোজা ভেঙে যাবে।

ই'তিকাফ:

ই'তিকাফ আরবি 'উকুফ' শব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন জিনিসকে আঁকড়ে ধরা, কোন স্থানে অবস্থান করা। শরীয়তের পরিভাষায় মহান আল্লাহতালার সন্তুষ্টি ও নৈকট্য লাভের আশায় মসজিদে অবস্থান করা।

ই'তিকাফের উদ্দেশ্যে:

ই'তিকাফের উদ্দেশ্য হচ্ছে সৃষ্টির সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা। এতে আল্লাহর সাথে বান্দার সম্পর্ক গভীর হয় ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

ই'তিকাফের ফজিলত:

রাসূল (সা.) বলেছেন-'' যে ব্যক্তি রমজানের ১০ দিন ই'তিকাফ করে সে দুই হজ ও দুই ওমরার সমান সওয়াব লাভকারী হবে''। '(বায়হাকী)

রাসূল সাঃ বলেন -'' যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একদিন ই'তিকাফ করবে, আল্লাহ তা'আলা তার ও জাহান্নামের মধ্যে তিন খন্দক (পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্ত) পরিমাণ দূরত্ব সৃষ্টি করেন''(তাবারানী ও হাকিম)

রাসূল সাঃ -এর ই'তিকাফ: আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত -নবী করীম(সা. প্রতি রমজান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী,মুসলিম)

আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত-মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ সুবহানাহুতায়ালা নবী সাঃ কে মৃত্যু দেন করার আগ পর্যন্ত তিনি নিয়মিতভাবে রমজানের শেষ ১০দিন ই'তিকাফ করতেন। (বুখারী, মুসলিম)

ই'তিকাফের প্রকারভেদ :

ই'তিকাফ তিন প্রকার। যথা:

১. ওয়াজিব: ই'তিকাফ করার মান্নত করলে তা পূর্ণ করা ওয়াজিব।

২. সুন্নাত: রমজানের শেষ ১০ দিন ই'তিকাফ করা সুন্নত।

৩. মুস্তাহাব: ওয়াজিব ও সুন্নাত ই'তিকাফ ব্যতীত অন্য সকল ই'তিকাফ হচ্ছে মুস্তাহাব।

ই'তিকাফের শর্ত:

১. মুসলমান হওয়া: অমুসলিমের উপর ই'তিকাফ করা কর্তব্য নয়।

২. সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া।

৩. বালিগ হওয়া: নাবালিগ শিশুর উপর ই'তিকাফ করা কর্তব্য নয়।

৪. নিয়ত করা: ই'তিকাফের নিয়ত করা ব্যতীত ই'তিকাফ সহীহ হবে না।

৫. মসজিদে ই'তিকাফ করা : পুরুষদের জন্য মসজিদে অবস্থান করা।

ইতিকাফের নিয়মাবলী

১. মসজিদের ভেতর পর্দা দিয়ে থাকার ব্যবস্থা করবে।

২. ইতিকাফের স্থানে খাবার খাবে ও শুবে।

৩. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে ও ফরজ গোসলের জন্যে বেরুতে পারবে।

৪. মহিলারা নিজ নিজ গৃহে ই'তিকাফ করবে।

ই'তিকাফের মুস্তাহাব কাজ :

১. কুরআন তিলাওয়াত করা ও অধ্যায়ন করা।

২. জিকির-আযকার করা।

৩. দ্বীন সম্পর্কিত গবেষণা ও রচনার কাজ করা।

৪. দ্বীনের মাসাইল শিক্ষা করা।

৫. তওবা-ইস্তিগফার করা।

৬. তাসবীহ তাহলীলে নিমগ্ন থাকা।

নিষিদ্ধ সিয়াম

বছরের পাঁচটি দিন সিয়াম পালন নিষিদ্ধ। এগুলো হলো -

১. ঈদুল ফিতরের দিন।

২. ঈদুল আযহার দিন। (জিলহজ মাসের ১০ তারিখ)

৩. জিলহজ মাসের ১১ তারিখ।

৪. জিলহজ মাসের ১২ তারিখ।

৫. জিলহজ মাসের ১৩ তারিখ।

মহিলাদের জন্য ই'তিকাফের বিধান:

মহিলারা নিজ নিজ ঘরে ই'তিকাফ করবেন। যেখানে তারা নামাজ পড়ে থাকেন। তাদের জন্য মসজিদে ই'তিকাফ করা জায়েজ নেই।

ই'তিকাফ অবস্থায় নারীর হায়েজ অথবা নিফাস শুরু হলে তখন ই'তিকাফ ছেড়ে দিতে হবে। কারণ,হায়েজ-নিফাস অবস্থায় ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যায়।

নফল রোজার গুরুত্ব

ইসলামে ইবাদতের গুরুত্ব অনেক। ঈমানের পরই ইবাদতের স্থান। ইসলাম যেহেতু আসমানী দ্বীন, মানবজাতির জন্য আসমানী নির্দেশনা, একারণে তার অনেক বৈশিষ্ট্যের একটি হচ্ছে পূর্ণাঙ্গতা। ইসলাম যেমন মানুষের হক সম্পর্কে নির্দেশনা দান করেছে তেমনি দান করেছে আল্লাহর হক সম্পর্কে। শুধু নির্দেশনাই নয়, মানুষের হক ও আল্লাহর হকের বিস্তারিত বর্ণনাও দান করেছে। শুধু বর্ণনাই নয় সেই হক আদায়ের পন্থা ও পদ্ধতিও নির্দেশ করেছে।

বস্তুর মোহে আক্রান্ত মানবজাতিকে আল্লাহর হক সম্পর্কে এবং সেই হক আদায়ের সঠিক পন্থা সম্পর্কে ইসলামই সচেতন করে, যা পূরণ করার মাধ্যমে আল্লাহর বান্দা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হয়।

এক অর্থে ইসলামের সকল বিধান পালন করা আল্লাহর হক। আল্লাহর আদেশ পালন বান্দার অপরিহার্য কর্তব্য। সেই সকল আদেশের মধ্যে যেমন রয়েছে ঈমান ও ইবাদত তেমনি রয়েছে মানুষের পারস্পরিক হক সংক্রান্ত বিধি-বিধান। এই উভয় প্রকারের বিধান পালন বান্দার উপর আল্লাহর হক হলেও বিশেষ তাৎপর্যের কারণে ঈমান, তাওহীদ, ইবাদত-বন্দেগীকে আল্লাহর হক শিরোনামে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়।

ইসলামে ইবাদতের স্থান অতি উচ্চে। সহীহ বুখারীর বিখ্যাত হাদীসে ইসলামের যে পাঁচটি স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে তন্মধ্যে প্রথমটি হচ্ছে ঈমান আর পরের চারটি হচ্ছে চার ফরয ইবাদত- সালাত, যাকাত, সওম ও হজ¦। কাজেই ইবাদত-বন্দেগীর বিষয়ে যত্নবান হওয়া দ্বীনের অন্যতম মৌলিক চাহিদা।

ইবাদত-বন্দেগীর মধ্যেও দুটি প্রকার রয়েছে : এক. যা অবশ্য-পালনীয় আর দুই. যা ঐচ্ছিক। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, অবশ্য-পালনীয় ইবাদতসমূহের গুরুত্ব ঐচ্ছিক ইবাদতসমূহের চেয়ে বেশি। হাদীস শরীফে পরিষ্কার বর্ণিত হয়েছে, 'বান্দা আল্লাহ তাআলার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য অর্জন করে ফরয ইবাদতের মাধ্যমে।'

তবে নফল ও ঐচ্ছিক ইবাদতের ফযীলতও এত বেশি যে, তা মুমিনকে উদ্দীপ্ত ও আগ্রহী করে তোলে। বর্তমান নিবন্ধে আমরা শুধু একটি ইবাদত- নফল রোযা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করব।

হাদীস শরীফে নফল রোযার অনেক প্রকার ও অনেক ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও নফল রোযা রেখেছেন, উম্মতকেও এর ফযীলত শুনিয়েছেন। এখানে কিছু নফল রোযার বৃত্তান্ত তুলে ধরছি, যাতে যার পক্ষে যেটি সহজ হয়, আমল করতে পারেন।

১. শাওয়ালের ছয় রোযা

হযরত আবু আইয়ূব আনসারী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمّ أَتْبَعَهُ سِتّا مِنْ شَوّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدّهْرِ.

যে মাহে রমযানের রোযা রাখল এরপর শাওয়ালে ছয়টি রোযা রাখল এটি তার জন্য সারা বছর রোযা রাখার সমতুল্য হবে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৪

সহীহ মুসলিমের ভাষ্যকার ইমাম নববী রাহ. এই হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আমাদের মনীষীদের মতে, উত্তম হচ্ছে ঈদুল ফিতরের পরের ছয় দিন পরপর রোযাগুলো রাখা। তবে যদি বিরতি দিয়ে দিয়ে রাখে বা মাসের শেষে রাখে তাহলেও 'রমাযানের পরে'

রোযা রাখার ফযীলত পাওয়া যাবে। কারণ সব ছুরতেই বলা যায়, 'রমযানের পরে শাওয়ালের ছয় রোযা রেখেছে।' -শরহু সহীহ মুসলিম, নববী

২. যিলহজের নয় দিনের রোযা

বিশেষত ইয়াওমে আরাফা বা নয় তারিখের রোযা যিলহজে¦র নয় দিনের রোযার বিষয়ে হাদীস শরীফে এসেছে-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجّةِ.

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজে¦র নয় দিন রোযা রাখতেন। -সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩৭

আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، إِنّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السّنَةَ الّتِي قَبْلَهُ وَالسّنَةَ الّتِي بَعْدَهُ.

আরাফার দিনের রোযার বিষয়ে আমি আল্লাহর কাছে প্রত্যাশা করি যে, (এর দ্বারা) বিগত বছরের এবং তার পরের বছরের গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৯

সহীহ মুসলিমে হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসেও এই ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২)

৩. মুহাররম ও আশুরার রোযা

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

أَفْضَلُ الصِّيَامِ، بَعْدَ رَمَضَانَ، شَهْرُ اللهِ الْمُحَرّمُ، وَأَفْضَلُ الصّلَاةِ، بَعْدَ الْفَرِيضَةِ، صَلَاةُ اللّيْلِ.

রমযানের পর উত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের রোযা। আর ফরয নামাযের পর উত্তম নামায হচ্ছে রাতের নামায। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬৩

হযরত আবু কাতাদা আনসারী রা. থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আশুরার রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছেন-

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ.

এই রোযা বিগত বছরের কাফফারা হয়ে যায়। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৬২

আশুরার রোযার বিষয়ে উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা রা. বলেন-

كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصُومُ عَاشُورَاءَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ شَهْرُ رَمَضَانَ قَالَ: مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ.

কুরাইশের লোকেরা জাহেলী যুগেও আশুরার রোযা রাখত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও রাখতেন। এরপর যখন হিজরত করে মদীনায় এলেন, তখন নিজেও এই রোযা রাখলেন অন্যদেরও রাখার আদেশ দিলেন। এরপর যখন রমযানের রোযা ফরয হল তখন বললেন-

مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

যার ইচ্ছে সে তা (আশুরার রোযা) রাখতে পারে, যার ইচ্ছে না-ও রাখতে পারে। -সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫২; সহীহ বুখারী, হাদীস ২০০২

৪. শা'বান মাসে নফল রোযা

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেন-

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: لاَ يَصُومُ، فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ.

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অবিরাম) রোযা রাখতেন, যার কারণে আমরা বলতাম, আর বাদ দিবেন না। আবার (অবিরাম) রোযাহীনও থাকতেন, যার কারণে আমরা বলতাম, আর রাখবেন না। আমি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পুরো মাস রোযা রাখতে দেখিনি। তেমনি দেখিনি শা'বানের চেয়ে বেশি অন্য কোনো মাসে রোযা রাখতে। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৬৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১১৫৬

৫. সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোযা রাখা

উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা. বলেছেন-

كَانَ النبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَحَرّى صَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ.

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সোমবার ও বৃহস্পতিবারে রোযা রাখার ইহতিমাম করতেন। -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৫

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

تُعْرَضُ الأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالخَمِيسِ، فَأُحِبّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ.

সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলসমূহ পেশ করা হয়। তো আমার পছন্দ, আমার আমল যেন পেশ করা হয় আমি রোযাদার অবস্থায় । -জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৪৭

৬. মাসে তিন রোযা

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

شَهْرُ الصبْرِ، وَثَلَاثَةُ أَيّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صَوْمُ الدّهْرِ.

সবরের মাস (রমযান) ও প্রতি মাসে তিন দিন সারা বছর রোযার সমতুল্য। -সুনানে নাসায়ী ৪/২১৮, হাদীস ২৪০৮; মুসনাদে আহমাদ ২/২৬৩, হাদীস ৭৫৭৭

হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

إِذَا صُمْتَ مِنْ شَهْرٍ ثَلَاثًا، فَصُمْ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ.

তুমি যদি মাসে তিন দিন রোযা রাখ তাহলে তের তারিখ, চৌদ্দ তারিখ ও পনের তারিখ রোযা রেখো। -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৪৩৭; জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬১; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৪২৪

ইবনে মাজাহ'র বর্ণনায় আছে-

فَأَنْزَلَ اللهُ عَزّ وَجَلّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا فَالْيَوْم بِعَشْرَةِ أَيّامٍ.

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাবে এর সমর্থন রয়েছে, যে নেক কাজ করবে সে তার দশ গুণ পাবে। তো এক দিন সমান সমান দশ দিন। (সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদীস ১৭০৮)

৭. এক দিন পর পর রোযা

এই সওমকে হাদীস শরীফে 'সওমে দাউদ' বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা.-এর একটি চমৎকার ঘটনা হাদীসের কিতাবে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটি একদিকে যেমন ইসলামী শিক্ষার ব্যাপ্তি, সহজতা ও স্বাভাবিকতার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, তেমনি সাহাবায়ে কেরামের ইবাদত-প্রিয়তা ও আখিরাতমুখিতারও এক অনুপম নমুনা।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. তাঁর নিজের ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কাছে এলেন এবং বললেন, আমি কি শুনিনি যে, তুমি রাতভর নামায পড় আর দিনে রোযা রাখ? আমি বললাম, জী হাঁ! তিনি বললেন, এমনটা করো না। (নামাযে) দাঁড়াবে এবং ঘুমাবে, রোযা রাখবে এবং রোযা ছাড়াও থাকবে। কারণ তোমার শরীরেরও তোমার উপর হক আছে, তোমার চোখেরও তোমার উপর হক আছে, তোমার অভ্যাগতেরও তোমার উপর হক আছে এবং তোমার স্ত্রীরও তোমার উপর হক আছে। আর সম্ভবত তোমার আয়ু দীর্ঘ হবে। তোমার পক্ষে এ-ই যথেষ্ট যে, প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখবে, কারণ প্রত্যেক নেক আমলের পরিবর্তে আছে তার দশ গুণ। ফলে এটিই সারা বছরের রোযা হবে। তিনি বলেন, কিন্তু আমি কাঠিন্য অন্বেষণ করলাম, ফলে আমার উপরও কাঠিন্য বর্তাল। আমি বললাম, আমি তো এতদ্ভিন্নেরও সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে প্রতি সপ্তাহে

তিন রোযা রাখ। আমি আরো কাঠিন্য অন্বেষণ করলাম, ফলে আমার উপর আরো কাঠিন্য বর্তাল। আমি বললাম, আমি তো এতদ্ভিন্নের সামর্থ্য রাখি। তিনি বললেন, তাহলে আল্লাহর নবী দাউদের (আলাইহি ওয়া আলা নাবিয়্যিনাস সালাতু ওয়াস সালাম) রোযা রাখ। আমি বললাম, আল্লাহর নবী দাউদের রোযা কী? তিনি বললেন, 'নিসফুদ দাহর'। (অর্থাৎ একদিন পর একদিন রোযা রাখা।) -সহীহ বুখারী, হাদীস ৬১৩৪

সহীহ বুখারীরই অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস রা. যখন বৃদ্ধ হলেন তখন বলতেন-

يَا لَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

হায়! যদি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রুখসত গ্রহণ করতাম। -সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৭৫

এই হাদীস শরীফে যেমন এক দিন পর এক দিন- এভাবে রোযা রাখার নিয়মটি পাওয়া যায় তেমনি অন্যান্য হক ও করণীয় সম্পর্কে সচেতনতার বিষয়টিও পাওয়া যায়। সকল বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে চলা কাম্য।

শারীরিক সুস্থতার দিকে মনোযোগী হওয়ার শিক্ষাও এই হাদীসের একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। যখন নফল ইবাদতের ক্ষেত্রে শারীরিক সুস্থতা ও কর্মক্ষমতা রক্ষার নীতি অনুসরণীয় তাহলে অন্যায় ও গর্হিত কাজের মাধ্যমে সুস্থতা বিনষ্ট করার হুকুম কী হতে পারে তা খুব সহজেই অনুমেয়।

শারীরিক শক্তিও আল্লাহ তাআলার নিআমত এবং তা দুনিয়াতে মানুষকে অফুরন্ত পরিমাণে দেওয়া হয়নি। কাজেই এই নিআমতের ব্যাপারেও মানুষকে হিসেবী ও দায়িত্বশীল হতে হবে। একে সৎকর্মে ব্যয় করতে হবে এবং এর যত্ন নিতে হবে, যাতে যথাসম্ভব বেশি নেক আমলে একে ব্যয় করা যায়।

এই হাদীসে স্ত্রী-সন্তান ও অতিথি-অভ্যাগতদের হকের কথাও স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাদেরকেও সঠিক পন্থায় সময় দিতে হবে এবং তাদের হক আদায় করতে হবে।

এই হাদীসে দ্বীনী তা'লীম-তারবিয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মোবারক নীতিরও একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। তিনি উম্মতকে ভারসাম্য রক্ষার বিষয়ে সচেতন করেছেন। কোনো একটি দিক বা একটি বিষয় যেন অন্য সকল দিক বা বিষয়ের উপর এমনভাবে প্রাধান্য বিস্তার না করে যে, অন্য বিষয়গুলো অবহেলিত হয়ে পড়ে- এটা খেয়াল রাখতে হবে। তেমনি অবকাশের বা ঐচ্ছিক ক্ষেত্রগুলোতে সহজ পন্থা অবলম্বনও হাদীস ও সুন্নাহর একটি মৌলিক শিক্ষা। এই নীতি নিজের ক্ষেত্রে এবং অধীনস্তদের ক্ষেত্রে অনুসরণ করা কাম্য।

নফল রোযার বিভিন্ন প্রকার ও তার ফযীলত সংক্রান্ত আলোচনাটি ইমাম আবু বকর আলআছরাম রাহ.-এর একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে শেষ করতে চাই, যার মাধ্যমে নফল রোযাসমূহের বিভিন্ন প্রকারের তাৎপর্য যেমন বোঝা যাবে তেমনি নফল ও ফরযের মধ্যে একটি তুলনাও বোঝা যাবে, যা ভারসাম্যপূর্ণ চিন্তা ও আচরণের জন্য খুবই প্রয়োজন। আর যা শুধু নফল রোযা নয়, যে কোনো নফল ইবাদতের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

বিভিন্ন প্রকারের নফল রোযা যেমন, মাসে তিন দিন রোযা, আইয়ামে বীযের রোযা, শা'বান মাসের রোযা ইত্যাদি বর্ণনার পর তিনি লেখেন-

وذلك أن أصل الفرض إنما هو الشهر المبارك الذي افترضه الله عز وجل، وأجمع أهل الإسلام على صومه، وكانت الفسحة فيما بعده للأمة، وكان الصوم بعده تطوعاً، وكانت الفضائل في بعضه أكثر منها في بعض، وكان من شاء استكثر من تلك الفضائل، ومن شاء استقل، ومن شاء تركها إلى غير حرج.

أما سمعت حديث طلحة بن عبيد الله في قول الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم حين سأله عن الصوم فذكر شهر رمضان، فقال: هل علي غيره، قال: لا، إلا أن تطوع ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة وذلك عند قوله: والذي بعثك بالحق لا أزيد على هذا شيئاً ولا أنتقص منه.

ومثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: إني لأبغض فلاناً، فكان مما احتج به عليه: أنه لا يصوم إلا شهر رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم، إن أدري لعله خيرٌ منك.

في أشباهٍ لهذا كثيرة.

وإنما يرى أنه كره أن يجعل شيئاً من هذه الفضائل في الصوم معلومة فيلم بها الناس، فتكون كالشيء المفترض عليهم، فأخذ ببعضها في وقت، وأخذ ببعضها في آخر، وذكر لكل شيء فضيلة؛ لئلا يلزم شيء واحد بعينه كأنه لا يجوز غيره، فيكون بمنزلة [.. ...] الواجب، ففي صوم ثلاثٍ من كل شهر فضلٌ، فإن تعمد به البيض كان أفضل، وإن صامهن في غير البيض فقد أخذ بفضلٍ دون فضل، وكذلك سائر ما ذكرناه.

অর্থাৎ, এ বিষয়ে বাহ্যত বিভিন্ন ধরনের বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে। মূল ব্যাপারটি হচ্ছে, এক্ষেত্রে ফরয হচ্ছে শুধু মাহে রমযানের রোযা। এই রোযার বিষয়ে গোটা মুসলিম উম্মাহ একমত। এই ফরয রোযার পর অন্যান্য রোযা ঐচ্ছিক, যাতে উম্মাহর জন্য অবকাশ রয়েছে এবং এই রোযাগুলোর মধ্যে ফযীলতের তারতম্যও রয়েছে। কাজেই যার ইচ্ছা ঐ ফযীলত বেশি অর্জন করবে, যার ইচ্ছা কম অর্জন করবে। কেউ অর্জন না করলেও কোনো অসুবিধা নেই। ঐ বেদুঈনের হাদীস তো বিখ্যাত যাতে আছে যে, তিনি যখন রোযা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন এবং আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযানের রোযার কথা বললেন তখন ঐ বেদুঈন সাহাবী বললেন, এছাড়া কি আমার উপর অপরিহার্য আরো কোনো রোযা আছে? আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না। সাহাবী বললেন, ঐ সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য (দ্বীন) দিয়ে পাঠিয়েছেন আমি এর চেয়ে বাড়াবও না, কমাবও না। তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সে যদি সত্য বলে থাকে তাহলে অবশ্যই জান্নাতে যাবে।

তেমনি আরেক হাদীসে আছে যে, এক ব্যক্তি বলল, আমি অমুককে দেখতে পারি না। এরপর এর কারণ হিসেবে বলল, সে রমযানের রোযা ছাড়া আর কোনো রোযা রাখে না। তো আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন-

قم إن أرى لعله خير منك.

উঠে যাও, আমি জানি না হতে পারে সে তোমার চেয়ে ভালো। -মুসনাদে আহমদ, হাদীস ৫/৪৫৫

এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ফযীলতের কাজগুলোর কোনো একটিকে এমনভাবে নির্ধারিত করে দেওয়া অপছন্দ করেছেন যে, লোকেরা এটাকে অবলম্বন করবে এবং তা ফরযের মতো হয়ে যাবে। কাজেই কখনো এই রোযা রেখেছেন, কখনো ঐ রোযা রেখেছেন এবং প্রত্যেকটিরই ফযীলত বয়ান করেছেন। যেন বিশেষ কোনোটি এমন না হয়ে দাঁড়ায় যে, এখানে অন্য কিছুর অবকাশ নেই, ফলে তা ওয়াজিবের মতো হয়ে যায়।

তো মাসের তিন রোযার ফযীলত রয়েছে। আর সেই তিন রোযা যদি হয় তের-চৌদ্দ-পনের তারিখ তাহলে আরো ভালো। তের-চৌদ্দ-পনের ছাড়া অন্য তারিখে রাখলেও এক ফযীলত পাওয়া যাবে। তেমনি অন্যান্য রোযা। -নাসিখুল হাদীসি ওয়া মানসূখুহু, ইমাম আবু বকর আল আছরাম পৃ. ১৭৬-১৭৮

ইমাম আবু বকর আলআছরাম রাহ. দ্বিতীয় যে হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তা মুসনাদে আহমাদে হযরত আবুত তুফাইল আমির ইবনে ওয়াছিলা আললাইছী রা.-এর 'মুসনাদে' মুরসাল সনদে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত। পূর্ণ রেওয়ায়েতটি নিম্নরূপ :

এক ব্যক্তি কিছু লোকের পাশ দিয়ে গমন করছিলেন, যাবার সময় তিনি তাদের সালাম দিলেন, তারাও সালামের জবাব দিলেন। তাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর ঐ মজলিসের একজন বললেন, আল্লাহর কসম! আমি এই লোকটির প্রতি আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ রাখি। উপস্থিত লোকেরা বললেন, ওয়াল্লাহ! তুমি একটা খুব মন্দ কথা বললে! আমরা অবশ্যই তাকে বিষয়টি জানিয়ে দিব। এরপর তারা তাদের একজনকে বললেন, এই যে অমুক! আপনি যান। সেই দূত গিয়ে গমনকারীকে ঐ ব্যক্তির কথাটি জানিয়ে দিলেন।

তিনি তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে বৃত্তান্ত জানালেন যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি মুসলমানদের একটি মজলিসের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলাম, যে মজলিসে অমুক ব্যক্তিও ছিলেন। আমি তাদের সালাম করি, তারা সালামের জবাব দেন। যখন তাদের অতিক্রম করে চলে আসি তখন তাদের একজন এসে আমাকে

জানালেন যে, অমুক ব্যক্তি আমার সম্পর্কে বলেছে যে, আমি তার প্রতি আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ পোষণ করি। তো আপনি তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, কেন তিনি আমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডাকলেন এবং অভিযোগকারী যা যা বলেছে তা তাকে জানালেন। অভিযুক্ত ব্যক্তি তা স্বীকার করে বললেন, আল্লাহর রাসূল! আমি তা বলেছি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদ্বেষের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি বললেন, আমি তার প্রতিবেশী, তার সম্পর্কে অবগত। আল্লাহর কসম আমি তাকে এই ফরয নামায ছাড়া, যা ভালো-মন্দ সব লোকই পড়ে, আর কোনো নামায পড়তে দেখিনি। তখন প্রথমজন বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কি কখনো আমাকে দেখেছেন, নামাযকে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বিলম্বিত করতে, কিংবা নামাযের অযুতে বা রুকু-সিজদায় ত্রুটি করতে।'

দ্বিতীয়জনকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে তিনি না-সূচক জবাব দিলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে এই রমযান মাস ছাড়া, যে মাসের রোযা ভালো-মন্দ সব লোকই রাখে আর কোনো রোযা রাখতে দেখিনি।

প্রথমজন বললেন, 'আল্লাহর রাসূল! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি কি আমাকে কখনো ফরয রোযা ভাঙ্গতে বা তার কোনো হক নষ্ট করতে দেখেছেন?'

বিষয়টি জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি না-সূচক জবাব দিলেন। এরপর বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তাকে কখনো কোনো ভিক্ষুককে কিছু দিতে দেখিনি এবং এই 'যাকাত' ছাড়া, যা ভালো-মন্দ সব লোকই আদায় করে, আর কোনো ভালো কাজে সম্পদ খরচ করতে দেখিনি।

প্রথমজন বললেন, আল্লাহর রাসূল! তাকে জিজ্ঞাসা করুন, আমি কি কখনো যাকাতযোগ্য কোনো কিছু গোপন করেছি কিংবা যাকাত উসুলকারীদের সাথে টালবাহানা করেছি।

এবারও দ্বিতীয় জন না-সূচক জবাব দিলে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন, যাও, আমি জানি না, হতে পারে সে তোমার চেয়ে ভালো।' -মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৩৮০৩, ২৩৮০৪

এই বর্ণনার মৌলিক বিষয়গুলো অন্যান্য দলীলের দ্বারাও প্রমাণিত। এতে যেমন ফরয ইবাদতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত হচ্ছে তেমনি নফল ইবাদতের একটি গুরুত্বপূর্ণ 'আদব'ও পাওয়া যাচ্ছে। আর তা হচ্ছে, নফল ইবাদতের কারণে অন্য কোনো মুসলিমের ব্যাপারে তাচ্ছিল্যের মনোভাব, এমনকি 'ধর্মীয় বিদ্বেষ'ও পোষণের সুযোগ নেই। ধর্মীয় বিদ্বেষের ক্ষেত্র এটি নয়। আর কোনো মুসলিমকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা তো এমন গুনাহ, যা নফলের ছওয়াবের তুলনায় অনেক মারাত্মক। কাজেই নফল ইবাদতের অন্যতম দাবি ও আদব হচ্ছে, অন্যের প্রতি অবজ্ঞা ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের মনোভাব থেকে পবিত্র হওয়া।

শেষ কথা

তাকওয়া অর্জনের এ মুবারক মাসে মুমিনদের ওপর অর্পিত হয়েছে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, সৃষ্টি হয়েছে পুণ্য অর্জনের বিশাল সুযোগ এবং প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে মহান চরিত্র অর্জনের সুন্দর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। এ অর্পিত দায়িত্ব পালন এবং সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আজ সারা বিশ্বের মুসলিমদের উচিত চারিত্রিক অধঃপতন থেকে নিজেদের রক্ষা করা, নেতিয়ে পড়া চেতনাকে জাগ্রত করা এবং সকল প্রকার অনাহূত শক্তির বলয় থেকে মুক্ত হয়ে হক প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞাকে সুদৃঢ় করা, যাতে তারা রিসালাতের পবিত্র দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারে এবং কুরআন নাজিলের এ মাসে কুরআনের মর্ম অনুধাবন করতে পারে, তা থেকে হিদায়াত লাভ করতে পারে এবং জীবেনের সর্বক্ষেত্রে একেই অনুসরণের একমাত্র মত ও পথ রূপে গ্রহণ করতে পারে। রমাদান আমাদের জীবনে বয়ে আনতে পারে অপরিসীম কল্যাণ। রমাদানের উদ্দেশ্যাবলি অর্জন করতে পারলে আমাদের জীবন হয়ে উঠবে সুন্দর, পূত-পবিত্র ও

মহিমান্বিত। পবিত্র মাহে রমযানের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সর্বজনীন-কল্যাণের শাশ্বত চেতনায় সকল অকল্যাণ ও আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মানবতাকে বিজয়ী করার পথে আমাদের এগিয়ে দিক। রমজানের শিক্ষার আলোকে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকল আমল কবুল করুন এবং আমাদের সবাইকে আরো উত্তম আমল করার তাওফিক দান করুন। আমীন

সমাপ্ত

এই থিসিস পেপারটি একটি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে পাবলিশ করা হয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল লিংকঃ https://www.academia.edu/110767732/